সেপ্টেম্বর 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

লিখবেন

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রমাতোষ সরকার ॥ অমিত চক্রবর্তী ॥ অপরাজিত বসু

●

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ অমিতাভ চৌধুরি ॥ কৃষ্ণধর ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ কবিতা সিংহ ॥ আনন্দ বাগচি ॥ সুনীল বসু ॥ অমিত রায় ॥ আশা দেবী ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ॥ অনিল কর্মকার ॥ বরুণ মজুমদার ॥ আশা দেবী ও আরও অনেকে

●

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ লীলা মজুমদার ॥ শ্রীপান্থ ॥ নারায়ণ সান্যাল ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥ সমরজিৎ কর ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ সঙ্কর্ষণ রায় ॥ বিমলেন্দু মিত্র ॥ কিন্নর রায় ॥ শঙ্কর ঘটক ॥ বৃন্দাবন বাগচি ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ সৌরেন ভট্টাচার্য ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

●

পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ শিশিরকুমার মজুমদার ॥ দিবাকর সেন ॥ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুনীত রায় ॥ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

পূজা বার্ষিকীর আকর্ষণ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

৬টি বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাস
১২টি বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি সাপেক্ষে রোমাঞ্চকর প্রবন্ধগুচ্ছ

বিজ্ঞান
২০০১

পশুপাখি ও জীবজন্তু ও গাছপালা নিয়ে রঙিন ফিচার

৪০ পৃষ্ঠার রঙিন চিত্রকাহিনী, কার্টুন ও কমিক্স

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বেরোবে পুজোর অনেক আগেই

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ পঞ্চম সংখ্যা সেপ্টেম্বর 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 ঃ **দপ্তর থেকে** ঃ থাইল্যাণ্ডের সেই জীবাশ্ম ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ জন কিংম্যানের বিচিত্র কেস মারে গেইনস্টার) অনুবাদ ঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 22 ঃ লিলিপুটের দেশে ॥ রতন বুড়ুয়া 31

বিশেষ রচনা ঃ জাটিংগা আজও রহস্যাবৃত ॥ মলয় মুখোপাধ্যায় 19 ঃ সংযোজনী ॥ অজয় হোম 21

পড়াশোনা ঃ স্থূল আণবিক ও গঠন সংকেত ॥ বিবেক রায় 17 পদার্থবিদ্যার কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 15 ঃ প্রাণিকলা ॥ দিনোজকুমার দে 18 ঃ অঙ্ক থেকে মজা ॥ নন্দলাল মাইতি 62 ঃ মৌলিক সংখ্যার মজা ॥ সুভাষচন্দ্র মজুমদার 16

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা ঃ মজার ইলেকট্রনিকস্ প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 51 ঃ সিমুলেশন—খেলতে খেলতে শেখা ॥ সন্দীপ সেন 52 ঃ জেরক্স ॥ পার্থসারথি বড়াল ॥ 54 ঃ নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং তারপর ॥ মৃন্ময়ী দাস 29 ঃ পৃথিবী থেকে দেখা ॥ সুবীর দত্ত 39 ঃ রেগুলেটর ॥ অভিজিৎ মিত্র 30 ঃ সেফটি ম্যাচ ॥ দেবব্রত রায় 50 ঃ কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা ॥ কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 6

রঙ্গীন ফিচার ঃ জানা অজানার খবর ॥ রেবতীভূষণ 11 ঃ ম্যাগেলানের সমুদ্রযাত্রা ॥ কিন্নর রায় 12 ঃ সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজ 14 ঃ গাঁদা ফুল ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 ঃ জিংকাইট ॥ অমরনাথ রায় 56 ঃ আইকিউ টেস্ট 56 ঃ জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজ 58

ছবিতে গল্প ঃ খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ওয়্যার অব দি ওয়ার্ল্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ভারতের গণিত চর্চায় স্মরণীয় যাঁরা ॥ চন্দন রুদ্র 27

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ শেওলার জন্মকথা ॥ বগলা যোগশর্মা 28

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নর বানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35

ধারাবাহিক প্রবন্ধ ঃ রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ॥ বিমান বসু 9

ছোটদের দপ্তর ঃ সিনিয়র ক্যুইজ, জুনিয়র ক্যুইজ, ফটো ক্যুইজ ও আইকিউ টেস্টের উত্তর দাতাদের নাম 59 ঃ নতুন ডিসকো লাইট ॥ দীপেন ভট্টাচার্য 61

প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 63 ঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ সুমন্ত মুখার্জী 64 ঃ শব্দকুট ॥ সুব্রত মাঝি 65 ঃ বিজ্ঞানের টুকরো খবর ॥ বিমান বসু 66

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল। **অন্যান্য ছবি** ঃ অলয় ঘোষাল ও পার্থসারথি মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর সম্পাদক রবীন বল সহসম্পাদক জয়ন্ত দত্ত

চিঠিপত্র

চাঁদের বুকে মানুষ

মে মাসের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে সুধাংশু পাত্র লিখেছেন—মানুষ এ পর্যন্ত দুবার চাঁদে নেমেছে। কিন্তু বিমান বসু তাঁর 'গ্রহ পরিচয়' গ্রন্থে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ঐ পুস্তকের 94 পাতায় নিম্নলিখিত Chart-টি আছে।

যে সব মানুষ চাঁদে গিয়েছেন

	চন্দ্রযান	চাঁদের কক্ষে ছিলেন	চাঁদে নেমেছেন
1.	অ্যাপোলো-11	মাইকেল কলিন্স	নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন
2	অ্যাপোলো-12	আর এফ. গর্ডন	সি কনর‍্যাড্ ও এ. এল বীন
3.	অ্যাপোলো-14	এ রুজা	এ. শেপার্ড এবং বি. মিচেল
4.	অ্যাপোলো-15	এ. বি ওয়ার্ডেন	ডি. আর স্কট এবং জে. বি আরউইন
5.	অ্যাপোলো-16	টি. কে. ম্যাটিংলে	জে. ডবলু. ইয়ং এবং সি. এম. ডিউক
6.	অ্যাপোলো-17	আর. ই. ইভান্স	এ. সেরননি ও এইচ স্মিট

সুধাংশুবাবু শুধু প্রথম দুবারের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শেষের চারবারের কথা কিছু বলেন নি।

এছাড়া, এপ্রিলের প্রশ্নোত্তর বিভাগে সুধাংশুবাবু নেপচুনের দুটি চন্দ্রের নাম লিখেছেন ট্রাইটন ও নেরিড। কিন্তু এছাড়াও নেপচুনের দুটি চন্দ্র আছে বলে বিমান বসুর 'গ্রহ পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে 'গ্রহ পরিচয়' গ্রন্থটিতে এদের কোনো নাম উল্লেখিত নেই।

তিনি (সুধাংশুবাবু) লিখেছেন, শনির বলয় তিনটি এবং এর 7টি উপগ্রহ। কিন্তু বিমান বসু 'গ্রহ পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন শনির উপগ্রহ 17টি। তিনি মোটামুটিভাবে ঐ গ্রন্থে এদের আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কোন্‌টি ঠিক? এছাড়া তিনি (বিমান বসু) লিখেছেন যে ভয়েজার-1-এর পাঠান ছবিতে দেখা গেছে যে শনির বলয়ের সংখ্যা তিন-চারটি নয়, কয়েক হাজার। কোন্‌টি ঠিক, সেটা জানতে পারলে ভাল হয়।

সুধাংশুবাবুর মতে শনির নিকটতম উপগ্রহ মিমাস ও দূরতম ফিবি। কিন্তু গ্রহ পরিচয়ের শেষ পৃষ্ঠার chart অনুযায়ী শনির নিকটতম উপগ্রহ 'উপগ্রহ-15' বইটিতে শনি থেকে উপগ্রহগুলির যে দূরত্ব দেওয়া আছে, তাতে সত্যিই এ উপগ্রহটি শনির সবচেয়ে কাছে।

তাছাড়া মে মাসের প্রশ্নোত্তর বিভাগে শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে প্লুটোর কোনো উপগ্রহ নেই। কিন্তু 'গ্রহ পরিচয়' বইটি অনুযায়ী প্লুটোর একটি উপগ্রহ আছে, যদিও তার কোনো নাম দেওয়া নেই। লেখা আছে যে 1978 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নৌসৈনিক মানমন্দির থেকে তোলা ছবিতে উপগ্রহটির সন্ধান পান J. W. Christy.

আমার এ সকল সন্দেহের অবসান হলে উপকৃত হব।

ছন্দোময় মণ্ডল, বি-15/77, লেকপ্লেস কল্যাণী, নদীয়া 741235।

এই বিষয়ে আরও যারা চিঠি লিখেছেন: **নবেন্দু মণ্ডল**, নাকপোতা নদীয়া। **সমীর কুমার সূত্রধর**, বঙাইগাঁও, আসাম। **অনিন্দ্য দে** 24 পরগনা। **রাজীব ঘোষাল**, কলকাতা-57।

পাঠকদের চিঠির উত্তর

প্রশ্নোত্তর বিভাগে "জীবন্ত জীবাশ্ম" এবং মানুষের চন্দ্রাবতরণ সম্পর্কে প্রশ্ন দুটিতে ত্রুটির উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছিলে অনেকে। দুটি প্রশ্নেই ত্রুটি ছিল। জীবন্ত জীবাশ্ম সম্বন্ধে উত্তরের শেষাংশ ভুলক্রমে ছাপা হয়নি। প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা দুটি শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যই প্রমাদ থেকে গেছে। আর মানুষের চন্দ্রাবতরণ সম্পর্কে ত্রুটি থেকে গেছে অসাবধানতাবশতঃ। কেবল বিমান বাবুর বইতে নয়, আমার নিজেরই লেখা "মহাকাশের হাজারো প্রশ্ন" বইতে ঐ একই কথার উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন দুটির ত্রুটি গত জুন সংখ্যায় সংশোধন করে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জুন সংখ্যাটি বিশেষ "ঘনাদা সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হওয়ায় প্রশ্নোত্তর বিভাগ সংযুক্ত হতে পারেনি। তারপরেই পেয়েছি তোমাদের চিঠিগুলো। তোমরা যাতে আরও বিজ্ঞান সচেতন হয়ে উঠতে পার এবং আরও যাতে উৎসাহী হও, তার জন্য তোমাদের চিঠি গত জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে তোমরা যে প্রশ্নোত্তর বিভাগটা মন দিয়ে পড়—তা জানতে পেরে আমি নিজেও উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েছি। সুধাংশু পাত্র
কালিন্দী, মেদিনীপুর

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

আমরা যারা গ্রামে থাকি তাদের অনেকের পক্ষেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সব ঘনাদা কাহিনী পড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। অথচ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য হয়ে কিছু করতে চাই।
শ্রীনিবাস সোম—২৪ পরগনা

বেলুন ওড়ে কেমন করে

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (মে 1986)-এ আবিষ্কারের গল্প 'বেলুন ওড়ে কেমন করে'-এর লেখকদ্বয় শ্রীঅলয় ঘোষাল ও শ্রীঋতুপর্ণ ঘোষ লিখেছেন —'জোসেফ মণ্টগোফায়ার আর জ্যাক মণ্টগোফায়ার বলে দুই ভাই ছিলেন। তাঁরাই প্রথম বেলুন তৈরি করেন। অনেক চিন্তা করে দু'ভাই বের করলেন যে একটা ব্যাগে যদি গরম হাওয়া ভর্তি করা যায় তাহলে সেটা বাতাসে ভাসতে পারে। এইভাবে প্রথম বেলুন তৈরি হল।···প্রথম উড়ল বেলুন 1783র 5ই জুন। তিনটি যাত্রী নিয়ে।···একটা হাঁস একটা মোরগ আর একটা ভেড়া,···'—পৃষ্ঠা 56

কিন্তু বেলুন আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'মণ্টগোফায়ার ভাতৃদ্বয়ে'র জন্মের পূর্বেই বেলুন আবিষ্কৃত হয়।

বেলুন ওড়ার প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ করা তারিখ হল 1709 সালের 8 আগস্ট। ব্রাজিলের ফাদার বারটোলোমেও দ্য গুসমাও (নরেনকো) [Father Bartolomeu de Gusmao (ne Lourenco)] জন্ম 1685, একটি আদর্শ বা মডেল্ গরম হাওয়া ভর্তি বেলুন (a model hot-air ballon) আবিষ্কার করেন। ঐ বেলুনটি পর্তুগালের টেরেইরো দো পাকোর ক্যাসা ডা ইণ্ডিয়ার বাড়ির মধ্যে ওড়ানো হয় 1709 সালের 8 (আট) আগস্ট তারিখে।

উৎস : Guinness Book of world Records, 1981 Edition, পৃষ্ঠা 324.

অন্যদিকে ফ্রান্সের জোসেফ মিশেল মঁগল্ফিয়ে (মণ্টগোফায়ার) (Joseph Michel Montgolfier, 1740-1810 এবং জ্যাকস্ এতিয়েন মঁগল্ফিরে (Jacques Etienne Montgolfier, 1745-1799) ভাতৃদ্বয় হাইড্রোজেন পূর্ণ কাগজের থলি (hydrogen-filled paper bags) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন 1783 সালে, অর্থাৎ উপরোক্ত ফাদার দ্য গুসমাও-এর প্রায় 74 বছর পরে। বরং বলা যেতে পারে, 1783 সাল থেকে বেলুন দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয়।

উৎস : Ballons For Research—R. T. Redkar.
(Science Today, November 1976, page 18)

দ্বিতীয়ত, ছোটদের বুক অব নলেজ (দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা, জানুয়ারী 1985, পৃষ্ঠা 612) গ্রন্থে লেখকদ্বয় উল্লিখিত 'হাঁস' এর উল্লেখ নেই, বরং 'ছাগল'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে মানুষের আকাশে ওড়ার কথা প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থেও পাওয়া যায়। আমরা 'রামায়ণ'-এ পুষ্পক রথে চড়ে আকাশে ওড়ার কথা পাই। ঠিক সেইভাবে 'গ্রীক পুরাণে'-এ পাওয়া যায় যে ডীডেলাস ও ইকেরাস পালক জুড়ে ডানা তৈরি করে সমুদ্রের উপর উড়ে বেড়িয়েছিল।

দান্তে (Dante) নামে একজন বিজ্ঞানী নাকি পাঁচশ বছর পূর্বে নকল পাখায় ভর করে একটি হ্রদের উপর ওড়েন।

মানুষের আকাশে ওড়ার কথা উঠলেই বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও আবিষ্কারক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci : 1452-1519)-র কথাও মনে আসে। তিনিই পৃথিবীর মানুষকে সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ার সম্ভাবনার ইংগিত দিয়েছিলেন। তিনি একটি বিমানের পরিকল্পনা করে সেই মত কাগজ-কলমে একটি খসড়া ছবি আঁকেন। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি।

সমীরকুমার সূত্রধর, বঙাইগাওঁ, আসাম।

অঙ্কের নম্বর বাড়াতে

লেখকের উত্তর : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বিশেষ ঘনাদা সংখ্যা'র চিঠিপত্রে প্রকাশিত রাধাশ্যাম মাইতি মহাশয়ের চিঠিটি পড়লাম। চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করছি।

এখানে a, b, c রাশিগুলি abstract রাশি। সুতরাং সেগুলির সংখ্যার মান কি কি হতে পারে তা আমরা জানি না। এমনও হতে পারে $a=2$, $b=-4$, $c=-4$ বা $a=3$, $b=-6$, $c=-6$ অথবা $a=\frac{1}{4}$, $b=-\frac{1}{2}$, $c=-\frac{1}{2}$ এরূপ অসংখ্য মান হতে পারে যেগুলির জন্য $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$ হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট ভাবে বলা যাচ্ছে না $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\neq 0$ কিনা ; অর্থাৎ শূন্য হতেও পারে নাও হতে পারে।

অঙ্ক শাস্ত্রে সবচেয়ে বড় কথা—রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে তা অসঙ্গত হয়ে যায়। ভেবে দেখুন তো যদি $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$ হয়, সেক্ষেত্রে $\div$ অসঙ্গত হবে কিনা ? $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right), x$ বর্জিত বলে যে এর মান শূন্য হতে পারে না, এটা কোন যুক্তি হতে পারে যদি a, b, c এর যে কোন মানের জন্য $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\neq 0$ হত, তবে এর মান শূন্য নয় বলে $(x-a-b)=0$ লেখা ঠিক হত। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে আমরা কল্পনা করতে পারি না এটা শূন্য নয়। কল্পনা করে কিছু বলা কি।

আপনি আরও লিখেছেন, আমার যুক্তিটি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর বুঝতে অসুবিধা হবে ; কিন্তু যা ঠিক তা অসুবিধা সত্ত্বেও শিখতে হবে।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীকান্তি বিশ্বাস। বাঁদিক থেকে : পর্ষদসচিব সুদিন চট্টোপাধ্যায় অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বিনয় চৌধুরি ও পর্ষদ সভাপতি রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

'শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে, এই অশিক্ষা দূর করতে হবে।'—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একথাগুলি বলেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। গত 26 জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী। শিক্ষা-মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলে জাতি পঙ্গু হয়ে যাবে। তাই অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কৃতী ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন পর্ষদ সভাপতি শ্রীরঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি শ্রীবিনয় চৌধুরী সমাজের নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানের শেষে অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পর্ষদ সচিব শ্রীসুদিন চট্টোপাধ্যায়।

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

1984-85 সালের মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রী।

সি. এম. ডি. এ কি কি করে

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চলাচলের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, সাবওয়ে, বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

এছাড়া সি এম ডি এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।

গত কয়েক বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন :

জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ)
৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা—১৭।

থাইল্যাণ্ডের সেই জীবাশ্ম

সমরজিৎ কর

উনিশ শতকের শেষের দিকেই হবে। ফরাসী ভূতাত্ত্বিক হেনরি কুনিলন ওই সময় লাওস-এর কাছে একটি জায়গায় আবিষ্কার করলেন কয়েকটি চোয়ালের জীবাশ্ম। এগুলি যে সরীসৃপজাতীয় কোন দুগ্ধপায়ী প্রাণীর চোয়াল হেনরির বুঝতে অসুবিধে হয় নি তখন। 1930 এর দশকে ওই লাওস-এরই অন্য একটি অঞ্চলে পাওয়া গেল ডাইনোসোরের অস্থি। এবারের আবিষ্কারকও একজন ফরাসী ভূতাত্ত্বিক। নাম জোসুয়ে হিলমাল হোফে। এই ঘটনার কিছুকাল পর থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের সরীসৃপের দাঁতের জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়। এর আগে অনেকে ভেবেছিলেন এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের জীবাশ্ম পাওয়ার কথা নয়। ভুলটা ভাঙল।

এখন তো রীতিমত হই হই কাণ্ড! থাই এবং ফরাসী বিজ্ঞানীরা একযোগে সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছ, উভচর প্রাণী এবং সরীসৃপের জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন। ওই অঞ্চলে এসব প্রাণী বাস করত মেসোজোয়িক যুগে। ভূতাত্ত্বিক যুগের এই সময়ে পৃথিবীর বুকে চলছে সরীসৃপদের রাজত্ব। যুগটির শুরু 24 কোটি বছর আগে। শেষ হয়েছে, তাও 6·5 কোটি বছর আগে তো বটেই।

পৃথিবীর বিস্তর জায়গায় তো প্রাচীন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। হয়ত জিজ্ঞেস করবে, হঠাৎ থাইল্যাণ্ডের জীবাশ্মের কথা উঠল কেন? তা নিয়ে এত হই হই এরই বা কারণ কি?

কারণ তো আছেই। বিজ্ঞানীরা দুটি কারণে ওই জীবাশ্মগুলির ব্যাপারে খুবই কৌতূহলী। এই যে মেসোজোয়িক যুগের কথা বললাম? এই যুগটিকে ভূতাত্ত্বিকরা তিনটি পৃথক ভুতাত্ত্বিক যুগে ভাগ করে থাকেন—শেষ ট্রাইঅ্যাসিক, জুরাসিজ এবং ক্রিটেসিয়াস। সেখানে এই তিন যুগের প্রায় সব রকমের জীবাশ্মই পাওয়া গেছে। মেসোজোয়িক যুগে একের পর এক বিভিন্ন প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায় এই জীবাশ্মগুলি থেকে। বলতে পার, এটা প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটা এই: পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরে পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম। কোন প্রাণী কত বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত সেটা আমাদের জানা। ধরা যাক, পাললিক শিলার কোন স্তরে কোন একটি প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেল। সেই প্রাণী কত বছর আগে বেঁচেছিল সেটা জানা থাকলে পাললিক শিলার ওই স্তরটি কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা বলে দিতে পারি। জানা যায় নানা রকম ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস—কোথাকার ভূস্তর কেমন ছিল, কোথায় কখন পাহাড় গড়ে উঠল এমন নানান বিষয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ওই জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে।

জানা গেছে, এক সময় থাইল্যাণ্ড ছিল খুদে খুদে দুটি পৃথক ভূখণ্ডের খণ্ডাংশগুলি নিয়ে। পরে ভূখণ্ড দুটি

থাইল্যাণ্ডের সেইসব বিচিত্র প্রাণী—যাদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে।

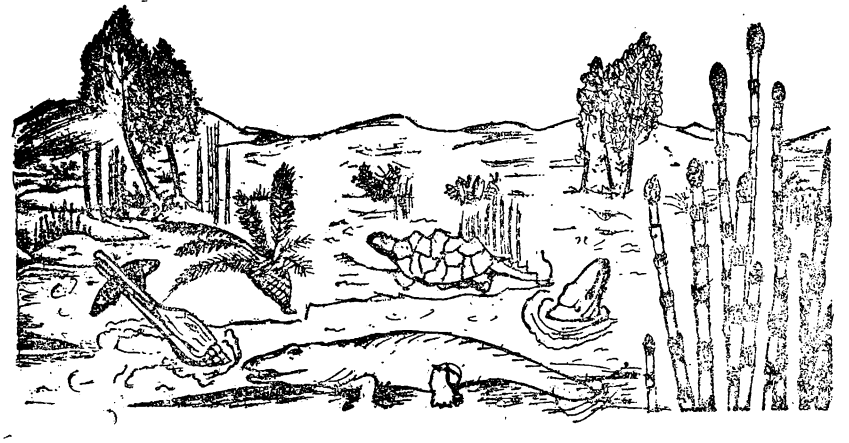

পরস্পর কাছাকাছি সরে এসে জুড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূখণ্ড দুটি আসলে দক্ষিণ গোলার্ধের সেই অতিকায় মহাদেশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডেরই অংশ। প্যালিও-জোয়িক যুগের কোন এক সময়ে তারা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরগতিতে উত্তর দিক বরাবর ভাসতে থাকে। অবশেষে তারা উত্তরাংশের অতিকায় মহাদেশ লরেশিয়ার সঙ্গে এসে মিলিত হয়। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়—চীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে ঠিক যে ভাবে আমাদের ভারত ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর বরাবর ভাসতে ভাসতে এশিয়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল, এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই ঘটেছিল।

খুদে খুদে ভূখণ্ডের ষোটি থাইল্যাণ্ডকে তৈরি করে ভূতাত্ত্বিকরা তার নাম দিয়েছেন ভারত-চীন ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডটির মধ্যে রয়েছে থাইল্যাণ্ডের উত্তর পূর্বাঞ্চলের খোরাট মালভূমি, কামপুচিয়া, লাওসের বেশির ভাগ অংশ এবং ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় খুদে ভূখণ্ড বা মাইক্রো-কনটিনেণ্ট-এর নাম সান-থাই ব্লক। এই অংশটির মধ্যে রয়েছে বর্মার পূর্বাঞ্চল, থাইল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল এবং মালয় উপদ্বীপের বেশির ভাগ অংশ।

থাইল্যাণ্ডের বেশির ভাগ জীবাশ্মই পাওয়া গেছে খোরাট মালভূমি থেকে। এদের মধ্যে রয়েছে নানা রকম মাছের জীবাশ্ম। কিছু কিছু ট্যাপা মাছের মত এক ধরনের জলজ প্রাণীরও জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এদের দাঁতগুলি প্লেটের মত শক্ত কাঠামোর সাহায্যে জোড়া। যারা এইসব প্রাণী শিকার করে জীবনধারণ করত, তাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের উভচর প্রাণী—সাইক্লোটোসরাস। এরা লম্বায় হত 1·5 মিটারের মত। এদের পা'গুলি ছিল দুর্বল, মাথার উপরের ভাগ চ্যাপ্টা। আর ওই চ্যাপ্টা মাথার উপর চোখ। এ থেকে মনে হয় ওরা বেশির ভাগ সময় নিজেদের দেহ জলের ভেতর ডুবিয়ে রাখত। জলের ওপর ভেসে থাকত শুধু ওদের চোখ।

চুলাভরন বাঁধ তৈরির সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আর এক ধরনের শিকারী প্রাণীর হাড় এবং দাঁতের জীবাশ্ম পাওয়া গেল। এদের নাম ফাইটোসর। আয়তনে ছিল কিছুটা বড়। সারা গায়ে পুরু এবং শক্ত খোলা। দাঁতগুলি ছিল তীক্ষ্ণ। সরীসৃপ জাতীয় এই প্রাণী দেখতে কতকটা কুমীরের মত। কিন্তু তাদের সঙ্গে কুমীরের কোন নিকট সম্পর্ক নেই। 'থেকোডনট' নামে এক ধরনের প্রাণী থেকে উৎপত্তি ঘটে ফাইটোসরদের। 'থেকোডনট' ট্রাইঅ্যাসিক যুগের এক ধরনের সরীসৃপ। এই সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে পরে জন্ম নেয় কুমীর এবং ডাইনোসর। এছাড়াও সেখানে পাওয়া গেছে এক ধরনের বিচিত্র কচ্ছপের জীবাশ্ম। এই কচ্ছপগুলিও বিচরণ করত ট্রাইঅ্যাসিক যুগে। আধুনিক কচ্ছপের দাঁত নেই। কিন্তু আদিম সেই কচ্ছপের মুখে ছিল একাধিক দাঁত। দক্ষিণ এবং মধ্য জার্মানি ছাড়া এ ধরনের কচ্ছপের জীবাশ্ম আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ট্রাইঅ্যাসিক যুগের শেষ নাগাদ ভারত-চীন খুদে ভূখণ্ড এবং লরেশিয়ার মধ্যে ভূসংযোগ ছিল। যার ফলে লরেশিয়ার বহু মেরুদণ্ডী প্রাণী ভারত-চীন অঞ্চলে (থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি) এসে বাস করতে থাকে। নইলে ওই অঞ্চলে তখন একমাত্র গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের প্রাণী এবং উদ্ভিদেরই বাস করার কথা।

খোরাট মালভূমির পশ্চিমে বাঁকা চাঁদের মত বিরাজ করছে ফুউইয়াং পর্বত। এই পর্বতের সাওখুয়া স্তরে ইরেনিয়ামের খোঁজ করতে গিয়ে রুম সংমির নামে থাইল্যাণ্ডের এক ভূতাত্ত্বিক 1976 সালে এই অঞ্চলে প্রথম ডাইনোসরের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। এছাড়াও এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে অতিকায় সরপদ প্রাণীরও জীবাশ্ম। ডাইনোসরদের মধ্যে এই প্রাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃহদাকার সরীসৃপ। লম্বায় পনের মিটারের মত। সরু এবং দীর্ঘ গলা। এরা গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকত। এ ধরনের প্রাণী ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও পাওয়া গেছে। জানা গেছে ফুলুয়াং-এ যে সব ডাইনোসর বাস করত তাদের উচ্চতা ছিল 1·8 মিটারের মত। ওরা ঘণ্টায় আট কিলোমিটারের মত পথ চলতে পারত।

মজার ব্যাপার এই, গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট ভূখণ্ড তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। সেইসব ভূখণ্ডেও তখন বাস করছিল নানারকম প্রাণী। তাদের মধ্যেও চলছে বিবর্তন। পরে তাদের অনেকে অবলুপ্ত হয়। আবার নতুন ধরনের প্রাণী হিসেবে বিকশিত হয়ে বেঁচে থাকে। ওই অঞ্চলের অনেকেই এখন ওই সব প্রাণীর বংশধর। কিছুদিন আগে বৃটিশ ভূতাত্ত্বিক অ্যাণ্টনি হ্যালাম বলেছেন, অতীতে জীবাশ্ম এবং বর্তমানের প্রাণীদের মধ্যে কতটা মিল, সেটা পরীক্ষা করে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের খণ্ডাংশগুলি কখন এশিয়ার সঙ্গে এসে জুড়ে গিয়েছিল অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তা আমরা বলতে পারব।

রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

1930 সালে যখন চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন সে সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপকের পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ গবেষণার কাজ তিনি চালাতেন সে সময় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর 210 নং বউবাজার স্ট্রীটস্থিত গবেষণাগারে। 1933 সালে তিনি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে আসেন সেখানকার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে। সেখান থেকে 1984 সালে অবসর গ্রহণ করার পর ব্যাঙ্গালোরেই ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স 'এর প্রাঙ্গণে এক নতুন গবেষণা কেন্দ্রের স্থাপনা করেন। তারই নাম রাখা হয় "রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান" (Raman Research Institute)। 1949 সালের জানুয়ারি মাসে, ষাট বছর বয়সে রমন ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তারপর 1970 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে একনিষ্ঠ ভাবে গবেষণা চালিয়ে যান। জগদীশচন্দ্রের মত রমনও তাঁর জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় ঐ প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান।

গবেষণার জন্য একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা রমনের বহুদিন থেকেই ছিল। 1934 সালে ব্যাঙ্গালোরে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স-'এর স্থাপনা করেন যেখান থেকে আজও বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা Current Science প্রকাশিত হয়। অ্যাকাডেমী ভবন নির্মাণের জন্য সে সময়কার মহীশূর সরকার ব্যাঙ্গালোরের উত্তর প্রান্তে 20 একর জমি দেন। ঐ জমিতেই পরবর্তী-কালে রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়।

রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ঢুকেই যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রমন নিজে প্রকৃতি প্রেমী ছিলেন, গাছপালা, ফুল ভালবাসতেন। তাই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণকে তিনি সুন্দর বাগানের মত সাজিয়ে তুলেছিলেন। ব্যাঙ্গালোরে তাঁর নিজস্ব বাগানবাড়ি ছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর এত টান ছিল যে তিনি প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণের মধ্যেই এক ভবনে থাকতেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁকে প্রতিষ্ঠান ভবনের প্রাঙ্গণেই দাহ করা হয়। ঐ পবিত্র স্থানটি একটি গাছ লাগিয়ে চিহ্নিত করা আছে।

রমনের জীবনকালে বহু বিষয় নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো হতো। তার মধ্যে ছিল পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহবিজ্ঞান এবং জীব-রসায়ন বিজ্ঞান। শেষ বয়সে রমন নিজে বর্ণ দর্শন (colour vision) নিয়ে এখানে গবেষণা চালিয়েছেন।

হীরের প্রতি রমনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তবে তার কারণ হীরের অর্থমূল্য নয়, বরং তার অসাধারণ সৌন্দর্য ও আণবিক গঠন। রমন হীরেকে এক অসাধারণ ঘনবস্তু বলে মনে করতেন। এক সময় তিনি তাঁর প্রতিটি ছাত্রকে হীরের কোনও একটা গুণ নিয়ে গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন, যদিও সে সব গবেষণার ফলে কোনও নতুন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। হীরের প্রতি রমনের এই অনুরাগের নিদর্শন আজও রমন প্রতিষ্ঠানের ভূতত্ত্বীয় সংগ্রহালয়ে দেখা যেতে পারে। রমনের নিজের সংগ্রহ করা বিভিন্ন আকারের প্রায় পাঁচশো হীরে ঐ সংগ্রহালয়ে রাখা আছে। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে কাটা ও পালিশ করা অবস্থায় যেমন গয়নাতে থাকে। বাকি রাখা আছে সদ্য খনি থেকে বের করা প্রাকৃতিক অবস্থায়।

রমনের মৃত্যুর পর 1972 সালে রমন প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। গবেষণার নতুন ক্ষেত্রেও চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে এখানে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিঃ পদার্থবিদ্যা এবং তরল স্ফটিক (Liquid crystal) নিয়ে গবেষণা চালানো হয়।

তোমরা হয়ত জান যে গত কয়েক দশকে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন এসেছে। রেডিও নক্ষত্র জগৎ ও কোয়াসার (Quasar) ইত্যাদির আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সামনে বহু প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ঐ সব প্রশ্নের উত্তর পাবার উদ্দেশ্যে বিশ্বের রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। রমন প্রতিষ্ঠানও এ বিষয় নিয়ে গবেষণার এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দুটি বিশেষ কার্যসূচী হল ডেকামিটার ও মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে জোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধ্যয়ন চালানো।

সম্প্রতি রমন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ভারতীয় জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে রেডিও-নক্ষত্র জগৎ সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরের কাছে গৌরিবিদানুরে ডেকামিটার, অর্থাৎ

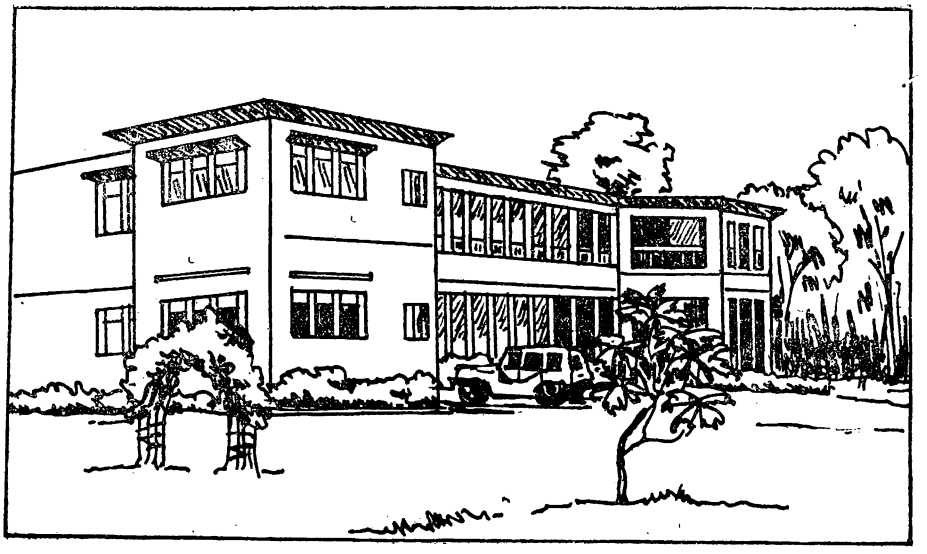

রমন
রিসার্চ
ইনসটিটিউট
ব্যাঙ্গালোর

দশ মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংকেত গ্রহণযোগ্য রেডিও দূরবিন চালু করেছেন। ঐ রেডিও দূরবিনটি বিশ্বে এ ধরনের বৃহত্তম রেডিও দূরবিনগুলির মধ্যে অন্যতম। এটির সাহায্যে বর্তমানে সূর্য, বৃহস্পতি, ছায়াপথ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য বহু রেডিও তরঙ্গ বিচ্ছুরণকারী গ্যালাক্সি ইত্যাদির অধ্যয়ন চালানো হচ্ছে।

গত দু'দশকে মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অধ্যয়ন চালিয়ে রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশে হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদির যৌগের সন্ধান পেয়েছেন। দেখা গেছে, মহাকাশের যে সব অঞ্চলে ঘন ধূলিমেঘ আছে ও তার মধ্যে যেখানে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে সে সব অঞ্চলেই এ ধরনের যৌগ অণুর প্রাচুর্য বেশি। এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্যে রমন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা দুটি মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেডিও দূরবিন তৈরি করেছেন। একটির অ্যান্টেনার ব্যাস 10·4 মিটার, অপরটির 1·5 মিটার।

রমন প্রতিষ্ঠানে গবেষণার আর একটি প্রধান ক্ষেত্র হলো লিকুইড্ ক্রিস্ট্যাল (liquid crystal) বা তরল স্ফটিক। সাধারণতঃ স্ফটিক বলতে আমরা কোনও কঠিন পদার্থই বুঝি। স্ফটিকের কয়েকটি বিশেষ গুণ, যেমন তাদের গঠনের নিয়মিততা, গলনাঙ্কের স্থিরতা ইত্যাদি কেবল মাত্র কঠিন অবস্থাতেই দেখতে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তরল স্ফটিক শব্দটি হয়ত শুনতে অদ্ভুত মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু তা নয়। এমন বহু তরল জৈব পদার্থ আছে যাদের মধ্যে স্ফটিকের কয়েকটি বিশেষ গুণ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সব জৈব পদার্থকেই তরল স্ফটিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আজকাল ডিজিটাল হাতঘড়ি, ক্যালকুলেটার ইত্যাদির পর্দায় যে নীলচে কালো অক্ষর বা সংখ্যা ফুটে ওঠে তাতেও এক ধরনের তরল স্ফটিক ব্যবহার করা হয়।

রমন প্রতিষ্ঠানে তরল স্ফটিক নিয়ে গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে গত দশ বছরে উল্লেখনীয় কাজ হয়েছে। বর্তমানে এখানে বিভিন্ন ধরনের তরল স্ফটিকের গুণাগুণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণা চালানো হচ্ছে। গবেষণা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও রমন প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রমন যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতি বছর 2 অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের জন্য বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। রমন নিজেই তাঁর প্রিয় কোনও একটি বিষয় নিয়ে ঐ "গান্ধী স্মারক বক্তৃতা" দিতেন। বক্তৃতার ভাষা হত সরল এবং সহজবোধ্য। 1959 থেকে শুরু করে 1970 সালের গান্ধী জয়ন্তী পর্যন্ত মোট বারোটি বক্তৃতা রমন দিয়েছিলেন। সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল বিবিধ, যেমন 'আলো, রং ও দৃষ্টি', 'সঙ্গীত ও বাজনা' 'হীরে', 'ফুলের রং', 'আবহাওয়া ও বিজ্ঞান', 'সবুজ পাতা', 'স্বর, বাক্‌শক্তি ও ভাষা', 'ভূমিকম্প' ইত্যাদি। বিষয়গুলি এতই আকর্ষণীয় যে বোঝাই যায় রমনের ঐ বক্তৃতামালা খুবই জনপ্রিয় ছিল। দুঃখের বিষয়, রমনের মৃত্যুর পর আর ঐ বক্তৃতামালা চালু রাখা হয় নি।

7-UF College Road, New Delhi-110001

কোনো কোনো পাখি ঘর সংসারের তাগিদে দরকারের বেশি বাসা তৈরি করে।

★★★

বাবুইরা তাদের হবু গিন্নীর পছন্দসই ঘরের নমুনা হিসেবে বাড়তি কয়েকটা বাসা বানিয়ে ফেলে। পরিপাটি আস্ত বাসার কাছাকাছি আধা-তৈরি কিছু কিছু বাসা ঝুলতে দেখা যায়। এক্‌সট্রা হোম ওয়ার্ক আর কি!

★★★

দর্জিপাখির (Tailor bird) এক নিকট বিদেশী জ্ঞাতি wren পাখিও এরকম বাড়তি হোম ওয়ার্ক করে থাকে।

★★★

কিন্নর রায়

ম্যাগেলানের দুঃসাহসিক অভিযান

1516 খ্রিস্টাব্দের শরৎকাল। একজন পঙ্গু সৈনিক পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল 1-এর সামনে নতজানু, এই সৈনিকের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ। তার আচার ব্যবহার নিয়েও অনেক রকম আপত্তি। রাজা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন কথা বলার জন্যে।

ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান নামের এই পঙ্গু সৈনিকের বয়েস এখন 36। জীবনের দীর্ঘ 8 বছর এই মানুষ তার দেশের সম্মান বজায় রাখার জন্যে চালিয়াছে অভিযান, যুদ্ধ করেছে, আফ্রিকায় এবং পর্তুগীজ ইন্ডিজে। এই সবের জন্যে তার শরীরে তিনটে গুরুতর আঘাত চিহ্ন, যার মধ্যে হাঁটুর আঘাতটি অত্যন্ত গুরুতর ফলে খোঁড়া হয়ে গেছে ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান।

ফার্দিনান্দ তার পেনশন বাড়ানোর ব্যাপারে প্রার্থনা জানিয়েছিল। কিন্তু রাজা ঝটপট পুরস্কার দেয়ার মতো মানুষ ছিলেন না, ফলে ব্যর্থ হলো তার অনুরোধ।

একটু অবাক, তার সঙ্গে দুঃখ পেয়ে ফার্দিনান্দ আবার প্রার্থনা করল—আমার পায়ের তো এই অবস্থা, আমাকে পাঠানো হোক ইন্ডিজ অভিযানে, আবার। দেখি পারি কি না ভাগ্য ফেরাতে।

রাজার দৃঢ় উত্তর, না। তোমার জন্যে কোন চাকরি খালি নেই পর্তুগালে। অপমানিত লাঞ্ছিত ম্যাগেলান শেষ বারের মতো আবেদন জানাল—আমায় সুযোগ দেয়া হোক, অন্য কোথাও, অন্য কোনো রাজার চাকরি করার জন্যে!

বিরক্ত রাজা ম্যানুয়েল জবাব দিলেন তুমি কোথায়, কার কাছে গিয়ে চাকরি করবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

কথাগুলো বিঁধে রইল বুকের গভীরে। ম্যাগেলান ফিরে এলো অসহ্য অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে। যোগাযোগ করল বন্ধু ফ্রান্সিসকো সেরানোর সঙ্গে। মালাক্কাতে ডেরা সেরানোর। ম্যাগেলানকে বলল, চলে এসো দোস্ত, আমার সঙ্গে। নিউগিনির পশ্চিমে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, মশলা-দ্বীপ নামেও যার অন্য পরিচিতি। এই দ্বীপের বেশির ভাগ মশলাই গায়ের জোরে দখল নিয়েছে ইউরোপের মানুষ। সেরানোর কথা থেকে জানা গেল মশলার ব্যবসায় প্রচুর লাভ।

ম্যাগেলান লিখে পাঠাল বন্ধুকে, ভাই, শিগগির আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। যদি পর্তুগাল থেকে যাওয়ার সুযোগ হয় তো ভালোই, নয়তো স্পেন থেকে। চিঠি লেখার পর গ্লোব, চার্ট নিয়ে বসে পড়ল ম্যাগেলান। মাথায় এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে—সম্প্রতি আবিষ্কৃত দক্ষিণ সমুদ্র (প্রশান্ত মহাসাগর) দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলে কেমন হয়! যদি আবিষ্কার করা যায় এই সমুদ্র-পথ, তাহলে তো দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রযাত্রার—আফ্রিকা ঘুরে যে অনেক অনেক মাস বছর পার করা অভিযান, তাতো সংক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে।

স্পেনের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী মানুষ তার এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। স্পেন থেকে ডাক এলো ম্যাগেলানের। পর্তুগাল ছেড়ে স্পেনে চলে আসা।

স্পেনের রাজা চার্লস। এর বয়েস 17। তিনি ম্যাগেলানের অভিযান প্রস্তাব অত্যন্ত আগ্রহ আর উৎসাহের সঙ্গে মেনে নিলেন। ম্যাগেলানের অদম্য অভিযান-আকাঙ্ক্ষা, আগের অভিযানের অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক জ্ঞান সবই মুগ্ধ করেছিল স্পেনের রাজাকে। এ ছাড়া স্পেনের যেটা স্বার্থ ছিল—তা হল মশলা-ব্যবসায়ে পর্তুগীজদের একচেটিয়া আধিপত্যের ব্যাপারটাকে খর্ব করা। নতুন পথ আবিষ্কার হলে নিশ্চয়ই তা খর্ব হবে

1518-র 22 মার্চ রাজা চার্লস অভিযানকে আর্থিক সহায়তা দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। ম্যাগেলান হলেন এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক। 5টি জাহাজ কেনা হল অভিযানের জন্যে। ম্যাগেলানের ফ্ল্যাগশিপের নাম ত্রিনিদাদ। অন্য জাহাজরা হল স্যান অ্যান্টনিও, দি কনসেপসিঅন, দি ভিক্টোরিয়া, দি স্যান্টিয়াগো। ম্যাগেলান জানাতে চাইল না কাউকেই, ঠিক কোথায় সে যেতে চাইছে। 250 জন নিয়ে তৈরি হল অভিযাত্রী

দল। এর মধ্যে ইতালিয়, ফরাসি, জার্মান, ফ্লেমিং, মুর, পর্তুগীজ, স্পেনীয়, আর কালো মানুষেরাও ছিল।

1519 সালের 20 সেপ্টেম্বর সব তৈরি হয়ে গেল। গর্জন করে উঠল কামান, দুলে উঠল পতাকা, নিশান। আটলান্টিকের পথে রওনা হলো পাঁচটি জাহাজ স্যান লুকার ডি বারামেডা থেকে। 26 সেপ্টেম্বর বহর পৌঁছল ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। খাবার জল ভরে নেওয়ার জন্যে এই বিরতি। দ্বীপে পৌঁছনোর এক ঘণ্টার মধ্যে ম্যাগেলানের নামে একটি প্যাকেট এসে হাজির। তার মধ্যে ছিল একটা খারাপ খবর সম্পর্কে সতর্কবাণী—'কার্টাজেনা আর তার লোকজন বিদ্রোহী হয়ে উঠে তোমায় খুন করতে পারে। সাবধানে থেকো।' খবরটা পাঠিয়েছে ম্যাগেলানের স্পেনের বন্ধুরা।

আটলান্টিকের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, ব্রেজিলের উপকূল ধরে এগোতে এগোতে, পাওয়া গেল অনুকূল বাতাস। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রিও-ডি-জেনেরোতে নোঙর ফেলল অভিযাত্রী দল, দুসপ্তাহ অলসভাবে কাটল এখানে।

স্থানীয় অধিবাসীরা এইসব ইউরোপীয়দের জন্যে বয়ে আনল আনারস, শুয়োর। বিনিময়ে পেল ঝলসানো শুয়োরের মাংস, বিস্কুট। জাহাজ কিছু কিছু সারাইও হল এখানে। তারপর আবার যাত্রা।

পথে যেতে যেতে নাবিকদের বিদ্রোহ। শক্ত হাতে তা দমন করতে হল ম্যাগেলানকে। বিদ্রোহী নাবিক নেতার মুণ্ডু পড়ল কাটা। পথে যেতে যেতে কোনো প্রাণীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না অনেকদিন। কিন্তু একদিন হঠাৎ ম্যাগেলান উলঙ্গ, প্রায় দৈত্যের মতো চেহারার একজন মানুষকে নাচতে দেখা গেল, ধুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে নিজের মাথায়।

অনেকটা পথ আসার পর দেখা গেল জল নেই, খাবার নেই। বিস্কুটে ইঁদুরের নাদির গন্ধ—তবুও এগিয়ে চলা। দু মাস কোনো ডাঙার চিহ্ন না দেখে এগিয়ে যেতে যেতে 24 জানুয়ারি দিগন্তরেখা দেখা গেল। আর দেখা গেল পাখি।

4 মার্চ—প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে থাকার 97 দিন চলে গেল। 'ত্রিনিদাদ জাহাজের শেষ খাবারের কণাটুকুও শেষ। এর দু দিন পর দেখা গেল ডাঙা। এখানে নেমে ভাত, ঝলসানো শুয়োর, নারকোল খেয়ে শরীর ঠিক করল নাবিকেরা। 16 মার্চ তারা আর একটা বড় দ্বীপ দেখতে পেল, তার নাম ফিলিপাইন।

1521-এর 27 এপ্রিল ম্যাকটান দ্বীপে ম্যাগেলান নামার পরই যুদ্ধ। স্থানীয় মানুষদের বর্শা, পাথর, বল্লম, তীর এসে পড়তে লাগল অবিশ্রান্ত। ম্যাগেলানের পায়ে বিদ্ধ হলো তীর। অন্য সৈন্যরাও আহত। তবুও ইউরোপীয়দের ছোট দলটি লড়ছে। বাঁশের বর্শা এসে বিঁধল ম্যাগেলানের মুখে। ম্যাগেলানের তলোয়ার ফুঁড়ে ফেলল একজনকে। তারপর স্রোতের মতো নেমে এলো আক্রমণ। নিহত হলো ম্যাগেলান।

ম্যাগেলানের মৃত্যুর পর 1 মে অন্য জাহাজী অফিসারদের নেমন্তন্ন করে হত্যা করল স্থানীয় মানুষেরা। 250 থেকে 114 জনে দাঁড়াল অভিযাত্রীরা।

1A, মুখার্জি পাড়া লেন, কলকাতা-26

সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট

সেপ্টেম্বর 1986 ॥ মান : IX/X

1. শের শাহের আদি নাম কি ছিল ?
2. 'সংবাদ কৌমুদী' নামক সংবাদপত্রটি কে প্রকাশ করেছিলেন ?
3. জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝের দূরত্ব হয় সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর এই সময়কার অবস্থানের নাম কি ?
4. ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি ?
5. পৃথিবীর বৃহত্তম নগর কোন্‌টি ?
6. আমাদের মধ্যকর্ণের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত শামুকের মত প্যাঁচানো একটি অংগ থাকে। ঐ অংশের নাম কি ?
7. স্ত্রী যৌন জনন এককে কি বলা হয় ?
8. নিচের কোন্‌টির ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাংক কমে যায় ?
   (ক) তামা (খ) মোম (গ) পিতল।
9. তুলাদণ্ড কোন্ শ্রেণীর লিভার ?
10. কোন্ ভারতীয় সর্ব প্রথম উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ?
11. 'লেডিবার্ড' পাখি নয়, তবে কি ?

সিনিয়র ফটো ক্যুইজ

নিচে কিসের ছবি বলতে পার ?

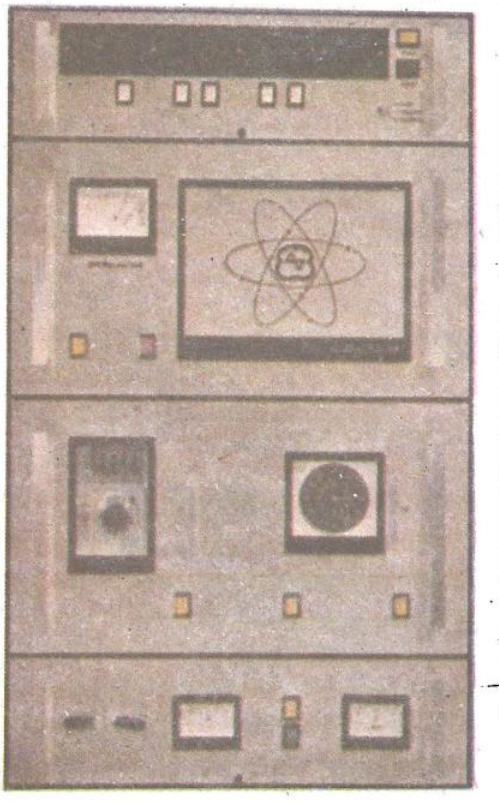

জুলাই-এ প্রকাশিত সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্টের সমাধান।

1. 1757 খ্রীস্টাব্দের 23শে জুন তারিখে।
2. ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র।
3. বুড়িগঙ্গার তীরে।
4. অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর।
5. শ্বাসমূল।
6. ন্যানোমিটার একক।
6. দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার।
8. 32 ফুট।
9. হ্যাঁ, আছে।
10. 80 ক্যালোরি প্রতি গ্রাম।
11. অযৌন।
12. ফোটো ক্যুইজের সমাধান : স্ফুটনিক
13. মস্কো শহরে।

শব্দকূট আগস্টের সমাধান

পড়াশোনা

পদার্থবিদ্যার কথা

অজয় চক্রবর্তী

সূর্য এবং গ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণ, কিংবা পৃথিবী এবং চাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণের সূত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিউটন এও বুঝতে পারেন যে, এ মহাকর্ষ বল কেবল সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ আকর্ষণ সার্বজনীন। নিউটন এই মহাকর্ষ বল সম্পর্কে একটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হন। এ সূত্রটি মহাকর্ষের বিশ্বসূত্র (universal law of gravitation) নামে পরিচিত। এ সূত্রানুসারে, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা অন্য সমস্ত বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে দু'টো রাশির ওপর (i) আলোচ্য বস্তুকণা দু'টোর ভরের উপর ও (ii) এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর। যদি বিবেচনাধীন কণাদ্বয়ের ভর m_1 এবং m_2 হয়, এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব r হয় তবে নিউটনের সূত্র অনুসারে, বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক আকর্ষণ বল

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

বা, $$F = G.\frac{m_1 m_2}{r_2} \qquad (1)$$

এখানে সমানুপাত ধ্রুবক G-কে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (gravitational constant) বলা হয়।

নিউটন এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গোলাকার সমসত্ত্ব বস্তুর মহাকর্ষ বল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, বস্তুটির সমগ্র ভর তার কেন্দ্রে সংহত অবস্থায় আছে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর পৃষ্ঠে m ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল নির্ধারণ করার সময় কল্পনা করা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত ভর ভূকেন্দ্রে সংহত আছে (চিত্র দেখ)।

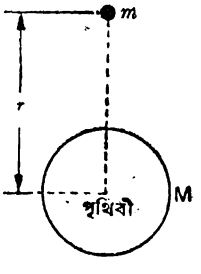

সুতরাং ভূকেন্দ্র থেকে r দূরত্বে বিদ্যমান m ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ (বা বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বল)

$$F = \frac{GMm}{r^2} \qquad \cdots(2)$$

এখানে M হলো পৃথিবীর ভর।

কাজেই, ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান কোন বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বল

$$F = \frac{GMm}{R^2} \qquad \cdots(3)$$

এখানে R হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ।

এ বলের প্রভাবে বস্তুটিতে যে ত্বরণ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় 'অভিকর্ষজ ত্বরণ'। এই ত্বরণকে 'g' দ্বারা সূচিত করলে লেখা যায়,

$$g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{R^2} \qquad \cdots(4)$$

পৃথিবীর ভর M-এর মান কত জানো? এর ভর মাপবেই বা কেমন করে? পুরো পৃথিবীটাকে দাঁড়িপাল্লায় চাপানোটা খুব সুবিধেজনক ব্যাপার হবে না। তবে কেমন করে মাপবো পৃথিবীর ভর? আপাতদৃষ্টিতে কাজটা খুব শক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজেই এ কাজটি করেছেন। সর্বপ্রথম পৃথিবীর ওজন মাপেন ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ। তিনি অবশ্য ঐ উদ্দেশ্যে একটি তুলাযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। যন্ত্রটির নাম ব্যাবর্তন তুলা (torsion balance)। এ তুলাযন্ত্র দিয়ে দু'টো সীসার গোলকের মধ্যবর্তী বল নির্ণয় করে তিনি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মান বের করেছিলেন। সেসময় অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান জানা ছিল; পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R-এর মানও মোটামুটি নির্ভুলভাবে জানা ছিল। কাজেই, পরীক্ষার সাহায্যে G-এর মান নির্ধারণ করে ক্যাভেণ্ডিশ পৃথিবীর ভর মাপতে সমর্থ হয়েছিলেন; কেননা সমীকরণ (4) থেকে আমরা পাই,

$$M = \frac{gR^2}{G} \qquad \cdots(5)$$

ক্যাভেণ্ডিশ G-এর যে মান পেয়েছিলেন তা ব্যবহার করে পৃথিবীর ভর পাওয়া যায় প্রায় 6×10^{24} কিলোগ্রাম।

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মান $6{\cdot}67 \times 10^{-11}$ N m^2/kg^2। এই মান খুবই কম বলে আকর্ষণকারী বস্তুর ভর বেশি না হলে মহাকর্ষীয় বল অনুভাব্য হয় না। মনে করি, 1 kg ভরবিশিষ্ট দু'টো গোলকের একটির কেন্দ্র অন্যটির কেন্দ্র থেকে 1 m দূরে আছে। এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল কত হবে মহাকর্ষ সূত্র থেকে তা নির্ণয় করা যায়। এই বলের মান

$$F = G.\frac{m_1 m_2}{r^2} = 6{\cdot}67 \times 10^{-11} (\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}) \times \frac{1\mathrm{kg} \times 1\mathrm{kg}}{(1\mathrm{m})^2}$$

$= 6{\cdot}67 \times 10^{+11}$N (নিউটন)

এই বল অতি নগণ্য। মহাকর্ষীয় বলের মান এতো কম বলে পার্থিব বস্তুদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের অস্তিত্ব আমরা টের পাই না। কিন্তু আকর্ষণকারী বস্তুর ভর যদি বিপুল হয় তবে মহাকর্ষ বলের মান অনুভাব্য হতে পারে। পৃথিবীর ভর বিপুল বলেই আমরা বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণের অস্তিত্ব টের পাই।

পৃথিবী কোন বস্তুকে যে বলে টানে তাকে আমরা ঐ বস্তুর 'ওজন' বলি। কাজেই, কোন বস্তুর ভর m হলে ভূপৃষ্ঠে বস্তুটির ওজন (W)-এর মান নিম্নের সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে ঃ

$$W = G\frac{mM}{R^2} = m.\left(\frac{GM}{R^2}\right) \qquad \cdots(6)$$

সমীকরণ (4) এবং (6) থেকে লেখা যায়,

$$W = m{\cdot}g \qquad \cdots(7)$$

বা, বস্তুর ওজন = বস্তুর ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ।

বস্তুর ভর স্থির রাশি, কিন্তু অভিকর্ষজ ত্বরণের মান স্থির নয়। স্থানভেদে এর মান বিভিন্ন হয় বলে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হতে পারে। পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন 10 kg-wt. চাঁদে সে বস্তুর ওজন 2 kg-wt.-এর চেয়েও কম। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের ভর অনেক কম বলেই চাঁদের পৃষ্ঠে অভিকর্ষ বলের তীব্রতা কম। পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বত্রও অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সমান নয়। তাই কোন বস্তুকে পৃথিবী পৃষ্ঠের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন বদলায়। সুতরাং, ভর যেমন কোন বস্তুর অপরিবর্তনীয় স্বধর্ম ওজন তেমন নয়। কোন বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তার ওজন শূন্য হয়, যদিও ভর একই থাকে। পৃথিবীর চারদিকে ভ্রাম্যমান কোন কৃত্রিম উপগ্রহে বিদ্যমান বস্তুরও কোন ওজন থাকে না। লিফ্‌টে করে ওঠা-নামার সময় তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, যখন স্থির লিফ্‌ট হঠাৎ উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন লিফ্‌টে দণ্ডায়মান ব্যক্তির মনে হয় যেন শরীরটা ভারী হয়ে গেছে।

আবার যখন স্থির লিফ্‌ট হঠাৎ নিচের দিকে নামতে থাকে তখন আরোহীর মনে হয় শরীরটা অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়ে গেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন কোন লিফ্‌ট ঊর্ধ্বগামী ত্বরণ নিয়ে চলে তখন আরোহীর দেহের ওজন বেড়ে যায় এবং যখন লিফ্‌ট নিম্নমুখী ত্বরণ নিয়ে চলে তখন আরোহীর দেহের ওজন কমে যায়।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, সায়েন্স কলেজ
কলকাতা-9

মৌলিক সংখ্যার মজা

সুভাষচন্দ্র মজুমদার

'যে সংখ্যা সেই সংখ্যা আর 1 বাদে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য নয় তাকে মৌলিক সংখ্যা (Prime Number) বলে'—এটা প্রায় সবারই জানা আছে।

এবার দেখা যাক্ এর মধ্যে কী মজা লুকিয়ে আছে। প্রথমে আমরা 1 থেকে 101-এর মধ্যের মৌলিক সংখ্যা-গুলি নিয়ে তাদের চারটে গ্রুপে ভাগ করলাম।

(a) 1, 11, 31, 41, 61, 71 ও 101
(b) 3, 13, 23, 43, 53, 73 ও 83
(c) 7, 17, 37, 47, 67 ও 97
(d) 19, 29, 59, 79 ও 89

এবার প্রত্যেক গ্রুপকে দুটো সাব্-গ্রুপে ভাগ করছি।

(a) (i) 1, 31 ও 61 ; (a) (ii) 11, 41, 71 ও 101 ;
(b) (i) 3, 23, 53 ও 83 ; (b) (ii) 13, 43 ও 73 ;
(c) (i) 7, 37, 67 ও 97 ; (c) (ii) 17 ও 47 ;
(d) (i) 19 ও 79 (d) (ii) 29, 59 ও 89.

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই আসল মজাটা বুঝে গেছ, তাই না ? দেখ প্রত্যেকটি সাব্-গ্রুপের মৌলিক সংখ্যা-গুলি একটা সিরিজে রয়েছে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি থেকে 2য় সংখ্যাটির ব্যবধান 30, আবার 2য়টির থেকে 3য়টির ব্যবধানও 30 (শুধু 3 ও 19 বাদে)। সোজা কথায় বলা যায়, পাশাপাশি যে-কোনো দুটো সংখ্যার ব্যবধান 30। এবার যে কোনো মৌলিক সংখ্যা নিয়ে তার সংগে 30 বা 30-এর গুণনীয়ক (Multiple) যোগ করলে অন্য একটি মৌলিক সংখ্যা পেয়ে যাবে অর্থাৎ 30 যোগ করে পেলে 60, 90, 120 এভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে। 30 যোগ করে যদি দেখা যায় 3 দ্বারা বিভাজ্য কোনো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তবে আর এগোনো চলবে না।

যেমন, x এর সঙ্গে 30 যোগ করে পেলাম y, যা নাকি 3 দ্বারা বিভাজ্য, অর্থাৎ $y = 3.m$। এবার y-এর সঙ্গে আবার 30 যোগ করলে হবে $(y+30)$, এটাও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে। তাই এটাও মৌলিক সংখ্যা হবে না।

$(y+30) = (3{\cdot}m+30) = [3(m+10)]$, এটা 3 দ্বারা বিভাজ্য।

প্রযত্নে ভূপেন্দ্রনাথ মধু, পূর্ব কালিয়ানিবাস (পলতা)।
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, 24 পরগনা 743102

স্থূল, আণবিক ও গঠন সংকেত

বিবেক রায়

রসায়ন বিজ্ঞানে কোন যৌগকে তিন রকম সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। স্থূল সংকেত, আণবিক সংকেতও গঠন সংকেত। স্থূল সংকেত হলো যৌগের সরলতম মৌল-সংকেত। এই সংকেত থেকে যৌগের একটি অণুতে উপাদান গুলির পরমাণুর সংখ্যার সরল অনুপাত জানতে পারা যায়। তাছাড়া এই সংকেত থেকে যৌগের উপাদান মৌল-গুলির নামও জানা যায়। যেমন ধর, CH_2O একটি স্থূল সংকেত। এটি গ্লুকোজের ($C_6H_{12}O_6$) স্থূল সংকেত। আবার CH স্থূল সংকেতটি জৈব যৌগ অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) অথবা বেঞ্জিন (C_6H_5) উভয়কেই বোঝাতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থূল সংকেত কোন যৌগকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুকে যার দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানো যায় তাকে ঐ মৌল বা যৌগের আণবিক সংকেত বলে। আণবিক সংকেতে অণুর মধ্যে উপাদান পরমাণুগুলির সঠিক সংখ্যা লেখা থাকে। যেমন, নাইট্রোজেন অণুর সংকেত N_2, হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2 এবং অ্যামোনিয়া অণুর সংকেত NH_3 ; তার মানে, তিন পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে এক অণু অ্যামোনিয়া যৌগ উৎপন্ন হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যৌগের অণুকে ভালভাবে বোঝাবার পক্ষে স্থূল সংকেতের চেয়ে আণবিক সংকেত অনেক বেশি কার্যকরী।

শুদ্ধভাবে আণবিক সংকেত লিখতে হলে যোজ্যতার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। মনে কর, তুমি পটাসিয়াম কার্বনেট নামক যৌগটির শুদ্ধ আণবিক সংকেত লিখতে চাও। তাহলে কি করতে হবে? প্রথমে পটাসিয়াম-এর চিহ্ন K এবং পরে কার্বনেট মূলকের চিহ্ন CO_3 চট্‌পট্‌ লিখে ফেল। লেখাটা তখন দাঁড়াবে এই রকম KCO_3. এখনও কিন্তু পটাসিয়াম কার্বনেটের আণবিক সংকেত শুদ্ধভাবে লেখা হয় নি, কারণ যোজ্যতার প্রয়োগ এখনও ঘটানো হয় নি। এইবার তা করতে হবে। আমাদের জানা আছে যে পটাসিয়াম-এর যোজ্যতা 'এক' এবং কার্বনেট মূলকের যোজ্যতা 'দুই'। এবার পটাসিয়ামের যোজ্যতা (1) কার্বনেট মূলককে দিয়ে দাও এবং কার্বনেট মূলকের যোজ্যতা (2) পটাসিয়ামকে দিয়ে দাও। এমনিভাবে যোজ্যতা বিনিময় করলেই পটাসিয়াম কার্বনেটের শুদ্ধ সংকেত অর্থাৎ K_2CO_3 পেয়ে যাবে। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট নামক যৌগটির আণবিক সংকেত লিখতে চাও কি? তাহলে আগের নিয়ম অনুসারে অ্যালুমিনিয়াম মৌল এবং সালফেট মূলকের চিহ্ন পাশাপাশি লিখে ফেল, অর্থাৎ লেখ $AlSO_4$। এখন যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা 'তিন' এবং সালফেট মূলকের যোজ্যতা 'দুই', সেইহেতু যোজ্যতা বিনিময়ের পর সালফেট মূলকের যোজ্যতা (2) পাবে অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা (3) পাবে সালফেট মূলক। এমনিভাবে যোজ্যতা বিনিময়ের ফলে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের শুদ্ধ আণবিক সংকেতটি হবে $Al_2(SO_4)_3$। তাহলে দেখলে তো শুদ্ধ আণবিক সংকেত লিখতে গেলে যোজ্যতার জ্ঞান কতটা দরকার।

এবার আসা যাক গঠন সংকেতের কথায়। কোন যৌগের মধ্যে তার উপাদান পরমাণুগুলি যেভাবে সজ্জিত থেকে অণুটির কাঠামো গড়ে তোলে, তাকেই সেই যৌগের অণুর গঠন সংকেত বলে। স্থূল সংকেত, এমন কি আণবিক সংকেতের চেয়েও গঠন সংকেত অনেক বেশি অর্থবহ, কারণ কোন যৌগের অণুর উপাদানগুলির নাম, অণুতে ঐ উপাদান মৌলগুলির পরমাণুর সংখ্যা, এমনকি ঐ পরমাণুগুলি কি ভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত, তা সবই জানা যায় ঐ গঠন সংকেত থেকেই। গঠন সংকেত লিখবার সময় যৌগের মধ্যেকার প্রতিটি মৌলের সঙ্গে তার যোজ্যতা অনুযায়ী এক বা একাধিক 'হাইফেন' বা যোজক রেখা আঁকা হয়। একযোজী মৌলের পাশে—, দ্বি-যোজী মৌলের পাশে=এবং ত্রিযোজী মৌলের পাশে≡চিহ্ন এঁকে যোজ্যতা রেখা বোঝানো হয়। নিচে কয়েকটি সুপরিচিত অজৈব ও জৈব অণুর গঠন সংকেত লিখে দেওয়া হলো। এর থেকেই গঠন সংকেতের ধারণাটা স্পষ্ট হবে আশা করি।

অ্যামোনিয়ার অণুর গঠন সংকেত :

সালফার ডাই অক্সাইডের অণুর গঠন সংকেত : $O=S=O$

ইথিলীনের অণুর গঠন সংকেত :

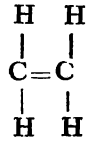

বেঞ্জিন অণুর গঠন সংকেত :

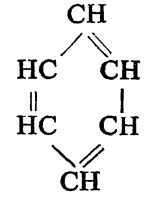

সংকেতের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করি। পরের বারে রাসায়নিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এন. বি. টি-99এ, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

প্রাণিকলা দিনোজ কুমার দে

প্রাণিরাজ্যে প্রাণীর সংখ্যা সীমাহীন। শুধু প্রাণী কেন উদ্ভিদের সংখ্যারও সীমা পরিসীমা নেই। আধুনিক ধারণা মানুষকে জানিয়েছে জীবের সৃষ্টি, সৌর-শক্তির প্রভাবে অ্যামোনিয়া ঘটিত নাইট্রোজেন যোগ থেকে। বর্তমান যুগে বিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদ মানুষকে এও জানিয়েছে যে বিবর্তনের ফলে নিম্ন স্তরের জীব হতে উচ্চ স্তরের জীবের সৃষ্টি। জীবজগতে প্রাণীদের মধ্যে একটি সরল জীব প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্গত অ্যামিবা। এই প্রোটোজোয়া পর্বের সমস্ত প্রাণীই এককোষী। একটিমাত্র কোষই সকল প্রকার জৈবনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু উচ্চ স্তরের প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত বললে ঠিক বলা হয় না। উচ্চ স্তরের প্রাণীর দেহ বেশ কতকগুলি অঙ্গের-ও সমন্বয়ে গঠিত। যেমন পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ফুসফুস ইত্যাদি। প্রতিটি অঙ্গের কাজও আলাদা আলাদা। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড যে কাজ করে ফুসফুস আবার সেই কাজ করে না। হৃৎপিণ্ড যে ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত ফুসফুস সেই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত নয়। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের কোষ ও ফুসফুসের কোষ আলাদা। শুধু হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসই নয় সমস্ত অঙ্গগুলির কোষই আলাদা আলাদা। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রাণিদেহের অসংখ্য কোষগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে শ্রম-বিভাগ। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড যে কোষগুলি দ্বারা গঠিত সেই কোষগুলির কাজ এক। আবার অস্থি যে কোষগুলি দ্বারা গঠিত সেই কোষগুলির কাজ আর এক। এই রকম একই কাজ বিশিষ্ট ও আকৃতিগত সাদৃশ্যযুক্ত কোষ সমষ্টিকে বলা হয় কলা। প্রাণিদেহে অঙ্গ গঠিত হয় নানারকম কলার সমন্বয়ে। বেশ কয়েকটি অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় তন্ত্র। এবং যে কোন উন্নত প্রাণীর দেহ এই রকম কয়েকটি তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত।

যে কোন উন্নত প্রাণীর দেহ যেমন মানুষের দেহে মোটামুটি চার প্রকার কলা দেখা যায়। কলাগুলি আবরককলা, যোজককলা, পেশীকলা ও নার্ভকলা নামে পরিচিত। আবরক বা আবরণী কলা দেখা যায় পেরি-কার্ডিয়ামে, প্লুরাতে, পেরিটোনিয়ামে ও রক্তনালীর ভিতরের আবরণীতে এবং মানুষের ত্বকে। এছাড়াও থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয় এবং লালাগ্রন্থিতেও আবরণী কলা দেখা যায়। আবরণী কলার অবস্থান দেখে বোঝা যায় আবরণী কলার কাজ দেহের বাহিরের ও ভিতরের অংশকে ঢেকে রাখা। এই কলার কাজ কেবল মুক্ত তলকে ঢেকে রাখাই নয়। এই কলা দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন কয়েকটি রসও ক্ষরণ করে। আবরণী কলা দুটি অঙ্গের মাঝে বিস্তৃত থেকে অঙ্গ দুটিকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষাও করে।

আবরণী কলার কোষগুলি একটিমাত্র স্তরে বা একাধিক স্তরে সাজান থাকে। কোষগুলি যে পর্দার উপর অবস্থান করে সেই পর্দাকে বলা হয় ভিত্তি পর্দা। হৃৎপিণ্ডের আবরণী, পাচকগ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে এককোষ স্তর বিশিষ্ট আবরণী কলা দেখা যায়। তাই এই ধরনের আবরণী কলাকে বলা হয় সরল আবরণী কলা। কোষের আকার বা আকৃতি অনুযায়ী আবরণী কলা চার প্রকার। যেমন—আঁইশাকার, স্তম্ভাকার, ঘনকাকার ও রোমযুক্ত। একাধিক কোষস্তর বিশিষ্ট বা যৌগিক আবরণী কলা দেখা যায় মূত্রাশয়ে, মুখগহ্বরে, গলাবিলে প্রভৃতি স্থানে। এই যৌগিক আবরণী-কলা বা স্তরীভূত আবরণী কলা বেশ কয়েকপ্রকার। যেমন—আঁইশাকার, পরিবর্তনসূচক, স্তম্ভাকার প্রভৃতি। স্তরীভূত আঁইশাকার আবরণী কলা নরম ও কঠিন উভয় প্রকার হতে পারে। নরম স্তরীভূত আঁইশাকার আবরণী কলা দেখা যায় গ্রাসনালীর আবরণীতে। কঠিন আঁইশাকার আবরণী কলার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে সাপের খোলস। পরিবর্তনসূচক আবরণী কলা রাবারের মত। পরিবর্তনসূচক আবরণী কলা কয়েক স্তর কোষ বিশিষ্ট। টান বা চাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই কলার কোষের সংখ্যা কমে যায়। আবার টান বা চাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। মূত্রাশয়ে—এইরূপ আবরণী কলা দেখা যায়। কখনও কখনও আবরণী কলার কোষ অকোষীয় বস্তুতেও রূপান্তরিত হতে পারে। অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণী কেঁচোর দেহের বাইরের কিউটিকল এই আবরণী-কলা দ্বারা তৈরি। পাখীর পালকও কিন্তু আবরণী-কলা দ্বারা তৈরি।

যোজক কলা অন্যান্য কলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কিম্বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে। যোজক কলার কোষের সংখ্যা কম কিন্তু ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স-এর পরিমাণ বেশি। যোজক কলা কয়েক প্রকার। প্রত্যেক প্রকার যোজক কলার প্রকৃতি ও কাজ আলাদা আলাদা। যোজক কলাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কলা হল এরিওলার কলা। এই কলা আমাদের চর্মের নীচে, অস্থিবন্ধনীতে, কণ্ডরা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। এই কলাতে কোষ ছাড়াও দুই প্রকারের তন্তু দেখা যায়।

মেদ-কলা বিভিন্ন অঙ্গের কাঠামো গঠনের জন্য প্রয়োজন। শুধু অঙ্গের কাঠামো গঠনই নয় অঙ্গটিকে আঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকেও বাঁচায়। (ক্রমশঃ)

জাটিংগা আজও রহস্যাবৃত

মলয় মুখোপাধ্যায়

তারিখ তো দূরের কথা, সালটাই কেউ ঠিক মতো বলতে পারে না। তবে একটা আন্দাজ করা হচ্ছে গত শতাব্দীর একদম শেষের ঘটনা। সবে বর্ষাটা গেছে। তখনো এখানে ওখানে মেঘ লুকিয়ে বসে আছে জঙ্গলের মধ্যে। পাহাড়ের গায়ে আটকানো রাস্তা ধরে জেমি নাগারা (Jemi Naga) চলেছেন পাশের তাঁবু থেকে কি যেন আনতে। অক্টোবরের গোড়ার দিক হলে কি হবে, হিমালয়ের বংশধর বলে পূর্বভারতের পাহাড়গুলোও তখনই গাঢ় শীতের দাবিদার।

ভদ্রমহিলা জেমি নাগারা পোষাক পরিচ্ছদে বেশ পরিপাটি ছিলেন, সেটা এখনকার ছবি দেখলেই বোঝা যায়। অমাবস্যার রাত। একটু একটু কুয়াশার ভাব এসেছে বাতাসে। বাঁশের মধ্যে তেল মাখানো কাপড় ঢুকিয়ে তার মাথায় আগুন লাগিয়ে সবাই টর্চ হিসাবে ব্যবহার করে এদিককার পাহাড়িরা।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের ধাপ ধরে নামছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন তাঁর চারপাশে দু-চারখানা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা বেশ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবলেন এত রাত্রে পাখি এলো কোথা থেকে। মানুষ-খেকোর জাত নাকি? এই থমকে দাঁড়িয়ে পড়াতেই উনি খেয়াল করলেন যে পাখিগুলো ওনার মশালটাকে (Bamboo torch) লক্ষ্য করেই এসেছে, ওনার জন্য নয়।

কিছুটা আন্দাজ করেই তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের

কাজটি করলেন। মশালটা একটা পাথরের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে একটা গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকলেন পাখিদের অদ্ভুত আচরণ, আর বর্তমানে আমাদের দিয়ে গেলেন এক ব্যাখ্যাহীন সমস্যা।

এই হল জাটিংগা গ্রামের পাখিদের অদ্ভুত আচরণের ইতিকথা। যা আজও জাটিংগাবাসীদের মুখে মুখে ফেরে। এবার গ্রামটা সম্বন্ধে একটু না বললে সমস্যাটা দানা বাঁধবে না। জাটিংগা হলো আসাম প্রদেশের উত্তর কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের ছোট্ট পাহাড়ি বসতি। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, গাঢ় সবুজ জংলী আবীর মাখানো। ছিটে ফোঁটা অভ্রের কাজ করেছে টিনের চালের বাড়িগুলো। এখানকার গড় উচ্চতা খুব একটা মন্দ নয়, প্রায় 750 মিটার। জিওগ্রাফার ও জিওলজিস্টরা এই অঞ্চলকে পূর্ব-ভারতের নাগা পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে খুব ছোট গ্রাম মনে হলেও জাটিংগার জনসংখ্যা এখন প্রায় 1500 কে ধরে ফেলেছে। বসতি দেড়শোর কিছু বেশি। যদিও নাগা উপজাতিরাই এই গ্রামের আসল বাসিন্দা কিন্তু আজ খাসি উপজাতির সিংটেঙ ছাড়া একটি ঘরও নাগা পাওয়া যাবে না। এই শতকের একদম গোড়ার দিকে (1902 কিম্বা 1903) খাসিরা নাকি নাগাদের তাড়িয়ে এই বসতি অধিকার করে নেয়। অবশ্য এই নিয়ে নাকি যথেষ্ট দ্বিমত আছে। অতএব ওতে না যাওয়াটাই ভালো মনে হয়।

তবে হ্যাঁ। জাটিংগা যে নাগাদের তৈরি গ্রাম ছিল তা বোঝা যায় তার নাম থেকে। জাটিংগা হোল নাগা শব্দ। যার মানে 'হাওয়ার পথ' (Passage of wind)। সারা বছর অনুভব করা না গেলেও কোনো কোনো মাসে বেশ বোঝা যায়।

আশপাশের প্রিয়জন বলতে পূর্বের ডলং, ফুরা; উত্তরের বড়া হাফলং, দিয়ঞ্জ; পশ্চিমের ছোট হাফলং গ্রামের লোকেরা। জাতিতে তারা কেউ কুকি কেউ নাগা, কেউ লুসন, কেউ বা আবার খাসি। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমানা করে দিয়েছে জাটিংগা নদী। গ্রামের ঠিক মাঝখানে জড়াজড়ি করে বসে আছে খাসিদের ঘরগুলো। এই বসতি থেকে দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ঢালের সাথে তাল মিলিয়ে নদীর দিকে যেতে হলে পথের মাঝে পাওয়া যাবে পানের বাগান। মালিকানা গ্রামবাসীদেরই। তবে গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ওলং নদীর পাড়ে ফলের বাগান অর্থনৈতিক ও গুণমানে পানের বাগানকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো গ্রামবাসীর বছরের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেকের বেশি এনে দেয় ঐ ফলের বাগান।

কাছাকাছি শহর বলতে উত্তর কাছাড় ডিস্ট্রিকটের হেড কোয়ার্টার হাফলং, কালো পীচের আঁকা বাঁকা 9 কিলো-মিটারের রাস্তাতেই যা একটু যোগাযোগ। ভৌগোলিক ভাষায় ওলং ও রব নদীর জলবিভাজিকার চূড়াটা ধরে এই পাকা রাস্তা। ঘরের স্কুল শেষ হলে অনেকেই যায় হাফলং শহরে আর একটু বেশি জানার বাসনায়। যদিও শহরে যাবার বাস আছে দু-একটা, কিন্তু তারা যে ভীষণ খেয়ালী।

জাটিংগা গ্রাম যে পাহড়ের গা আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তার নাম হল বরেইল (Barail)। বেশ বড়ো, হাত পা মেলে সে নাগা পর্বতমালার অনেকখানি জায়গাই নিজের দখলে রেখেছে। অবশ্য জাটিংগা গ্রাম থেকে প্রথমেই যার দিকে চোখ চলে যায়, সে হোল জাটিংগা হিল (Jatinga hill)। চোখে পড়ার কারণ বোধ হয় এর উচ্চতা (প্রায় 850 মিটার)। তবে দক্ষিণ পূর্বের কানকাহা (1870 মিঃ) শৃঙ্গ সবথেকে ওপরে থাকার দাবিদার।

আশপাশ থেকে জল চেয়ে নিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে মুখ করে জাটিংগা নদী সদাই বয়ে চলেছে বরাকের উদ্দেশ্যে। একটুও বিরক্তি নেই। কাছাকাছি বন্ধু বলতে রব ও ওলং নদী, যদিও তারা বয়ে চলেছে অন্যদিকে মুখ করে, যথাক্রমে উত্তর পূর্ব ও উত্তর দিকে।

এখানকার জঙ্গল যেমন বিভিন্ন ধরনের গাছে ভর্তি তেমনি পশুপক্ষীও কম ধরনের নয়। যেমন হাতি, বারকিং ডিয়ার, ভল্লুক প্রভৃতি থেকে শুরু করে বন্য বিড়াল পর্যন্ত। আর যারা জাটিংগা গ্রামকে পৃথিবীর সকলের কাছে মেলে ধরল, তারা হলো দেশ ও বিদেশ থেকে আসা নানান ধরনের পাখি এবং তাদের অদ্ভুত আচরণ। এই অঞ্চলের নিজস্ব পাখি ছাড়াও আগস্ট মাস থেকে শুরু করে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত, দূর দূরান্ত থেকে ডানায় ভেসে চলে আসার সংখ্যাও কম নয়।

এবার পাখিদের বিশেষ আচরণের কথাতেই আসা যাক্। আগস্ট মাসের শেষাশেষি থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত, কোনো কোনো বছর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হয়ে যায়। যদি নভেম্বরের প্রথম দিকটা অমাবস্যার মধ্যে থাকে তবেই। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের পাখি রাতের অন্ধকারে এই গ্রামের আশেপাশে একটু বড়ো আলো দেখলেই তার কাছাকাছি এসে বসে পড়ে। আর সব থেকে অদ্ভুত, কথা কিছুক্ষণ থাকার পর তারা আপনা থেকেই সেখানে মারা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে কুয়াশা মাখা অমাবস্যার রাতে নাকি এই আচরণ বেশি করে লক্ষ্য করা যায়।

যে মানুষ তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই দিয়ে দেয়, সে কখনও এমন সুযোগ ছাড়ে? শুধু যা সময়ের অপেক্ষা। প্রায় জুলাই মাস থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। পেট্রোম্যাক্স হলো মাধ্যম যার দ্বারা সহজেই পাখিদের কবজা করা যায়। প্রায়

প্রত্যেক ঘরেতেই দ্বটো একটা করে এই ল্যাম্প আছে।

আমার মনে হয় সকলেরই অদ্ভুত লাগবে যখন জানবেন যে পাখিদের এই ধরনের বিশেষ আচরণ শ্বধ্বমাত্র জাটিংগা গ্রামেই পাওয়া যায় আর কোথাও নয়। এমনকি ঠিক পাশের গ্রামগ্বলোতেও নয়। এর জন্য জাটিংগাবাসীরা বেশ গর্বিত।

এখন আবার ভারত সরকার এই বিষয়ের উপর নজর দিয়েছেন। জ্বলোজিকাল সারভে অফ ইণ্ডিয়ার (Z. S. I.) ডঃ সুধীন সেনগ্বপ্ত মহাশয়কে প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসাবে এই ধরনের পাখিদের বিশেষ আচরণের পর্যালোচনা করতে ভার দিয়েছেন।

গাড়ির সামনের সীট থেকে ম্বখ ঘ্বরিয়ে মিঃ এল, লাহং বল্লেন—স্যার, বছর দ্ব-তিন আগেও এক একজন প্রায় একশো করে পাখি পেত কোনো কোনো দিন। এখন তো একদম কমে গেছে। গত বছর কেউ পনেরো থেকে বিশটা পেয়েছে সেই অনেক পেয়ে গেছে। মিঃ লাহং এর কথাগ্বলো শ্বনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনে হল জাটিংগাবাসীরা হয়তো এই অজানা বিষয়টাকে জানারই সুযোগ রাখবে না। তাই ম্বখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এটা বন্ধ করা উচিত।

গ্রীন হর্ন, গ্রীন পিজিয়ন, করমোরাণ্ট, কিং ফিশারের মাংসের তুলনা হয় না, অসম্ভব তেল।

মিঃ লাহং হাফলং শহরের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়র। পাখিদের এই বিশেষ আচরণের কারণ হিসাবে কতকগ্বলো ঘটনার উল্লেখ করলেন। যার মধ্যে অনেকগ্বলোই ছিল ওনার নিজস্ব কথা এবং গ্রামের আশপাশ নিয়ে। আমার ক্ষ্বদ্র বৃদ্ধিতে এগ্বলো কোনো কারণই নয়। ভবিষ্যতের গবেষণার ফলই সব প্রমাণ করবে।

জানি না, হয়তো 1970 সালের 29শে আগস্টে ইণ্ডিয়ান্ এয়ার লাইন্সের এয়ার পকেটে ভেঙ্গে পড়া ফকার ফ্রেন্ডশীপ প্লেনটা হয়তো কিছ্ব স্বত্র ধরিয়ে দিতে পারে। আবহাওয়াবিদ্বদের মতে এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি এয়ার পকেট আছে। আর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে উইণ্ড প্যাসেজ। কোনো কোনো এয়ার পকেট বিশেষ বিশেষ ঋতুতে তীব্র হয়ে ওঠে, আবার কেউ বা চুপটি করে পাহাড়ের গা ঘেঁসে সারা বছর একই রকম থাকে। বলাই বাহ্বল্য, এয়ার পকেটের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে উইণ্ড প্যাসেজগ্বলোও একই রকম আচরণ করে। জাটিংগা গ্রাম এই রকম এক উইণ্ড প্যাসেজের মধ্যে অবস্থিত।

পাখিরা হয়তো এইসব এয়ার পকেটে পড়ে কিছ্বটা দিশাহারা হয়েই আলোকে লক্ষ্য করে ছ্বটে আসে স্বস্তির আশায়। কিন্তু হঠাৎ শরীরের ওপর বায়্বর চাপের পরিবর্তন এনে দেয় অসম্ভব ক্লান্তি যা তাদের মতো ক্ষ্বদ্র জীবরা সহ্য করে উঠতে পারে না। টেনে দেয় ছেদ।

অজয় হোম-এর সংযোজন

জেমি নাগা একটি সম্প্রদায়ের নাম। ঘটনা হচ্ছে এই—1885 খ্রিস্টাব্দে কিছ্ব জেমি নাগা পরিবার হাফলং-এর কাছ থেকে 'ঝুম' চাষের জন্য জাতিঙ্গায় আসেন। যখন তারা রাতের অন্ধকারে আগ্বন জেবলে জন্তু জানোয়ার তাড়াবার উদ্যোগ নিলেন, তখন তাঁরা দেখেন কিছ্ব পাখি সেই আগ্বনের কাছে এসে পড়ছে। সেই দেখে জেমি নাগারা ভয় পেয়ে যান। তাঁরা ভাবেন ওসব অপদেবতা বা ভ্বতের কাণ্ড। প্রায় প্রতিদিন রাতেই এই ঘটনা ঘটতে থাকে। শেষে তাঁরা লাখোন বাংগ স্বচিয়াং নামে জয়ন্তিয়া-জোয়াই-এর এক ভদ্রলোকের কাছে মাত্র 25 টাকায় জায়গাটা বিক্রি করে দেন।

এই খ্রিস্টান পরিবার স্বচিয়াং ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন র্পসিরা এই ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে বিশ্বাসই করেন না। তাঁদের কাছে এটা হল বিনা আয়াসে প্রোটিন সংগ্রহের ব্যাপার। সেই থেকে শ্বর্ব হয় হাজার হাজার পাখি মারার উদ্যোগ। বর্তমানে আসাম সরকারের সাহায্যে এবং স্থানীয় কিছ্ব লোকের কারণে 'পাখি বাঁচাও ক্লাব' সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পাখির এইভাবে মান্বষের হাতে মৃত্যুও কমে গেছে। জাতিঙ্গার সাধারণ লোকেরাও সচেতন হয়েছেন এবং তাঁরা পছন্দ করেন না বাইরে থেকে লোক এসে ওঁদের উপর খবরদারি কর্বক।

এই ঘটনাটি ঘটে হাফলং হিল স্টেশন থেকে জাতিঙ্গার হেলথ সেনটারের মধ্যেই বেশি। আমার বিশ্বাস, জাতিঙ্গার পাখিদের এই আচরণ বিশ্লেষণ করতে হবে বিকারতত্ত্ব (Pathology) ও শারীরবৃত্ত (Physiology) সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তি এবং কিছ্ব ভ্বিদ্যাবিশারদ (Geologists) যাঁরা হিল স্টেশন থেকে হেলথ সেণ্টারের মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভিটির বিচারে সক্ষম। কারণ, একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি এই ঘটনার সময়ে গ্রামবাসী কিছ্ব লোকের মধ্যে শ্বাসকষ্ট ও অলীক কল্পনা বাড়তে।

মিঃ লাহং প্রায় ম্বখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন, গভর্নমেণ্ট অবশ্য অবজেকশন্ দিয়েছিল এইভাবে পাখি হত্যা করার। কিন্তু তাই বলে কি আমার গ্রামবাসীরা ঘরের আলোও জ্বালতে পারবে না। ওরা যে নিজের থেকে এসে ধরা দেয়। ভীষণ টেস্টফুল স্যার ওদের মাংস। সব পাখির নাম বলতে পারব না, তবে

40, North Nowdapara Road, Cal-57

জন কিংম্যানের বিচিত্র কেস

মারে লেইনস্টার

অনুবাদ : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপারটা শুরু হয় ডাঃ ব্র্যাডেন যখন জন কিংম্যানের কেস হিস্ট্রি কার্ডটা নিয়ে দেখতে চাইলেন। মিডভিল মানসিক হাসপাতালে রোগীদের ইতিহাস রাখার ব্যবস্থা নিখুঁত আর চমৎকার। দেশের মধ্যে এটাই প্রাচীনতম মানসিক হাসপাতাল। এর চলতি নাম হল 'নতুন বেডনাম'। কার্ড রাখার ব্যবস্থা নিখুঁত হলেও তরুণ ডাক্তার ব্র্যাডেনের মনে হল এটায় কিছু ত্রুটি রয়েছে।

কার্ডে লেখা ছিল এই : 'জন কিংম্যান। ফর্সা, পুরুষ, উচ্চতা 5 ফিট 8 ইঞ্চি, বাদামী-কালো চুল।' শারীরিক খুঁত : 'রোগীর দুই হাতেই ছটি আঙুল এবং সব আঙুলই কাজ করে। এ ছাড়া শরীরের গঠন স্বাভাবিক। জন্মস্থান·····।' অর্থাৎ সেখানে কিছুই লেখা ছিল না। রোগের বিবরণ : 'মস্তিষ্ক বিকৃতি। নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা।' এখানে মন্তব্য দেওয়া ছিল এই : 'রোগী আপাতদৃষ্টিতে ইংরাজী বুঝতে সক্ষম। কথা বলে না।' এর পরে আবার শূন্য স্থান। 'রোগীর নিকট আত্মীয়·····। ভর্তির তারিখ·····' এখানেও ফাঁকা।

মিডভিল হাসপাতালের ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্ডটা অসম্পূর্ণ। কোন রোগীর বয়স আর জাতিগত ব্যাপারটা উহ্য থাকা সম্ভব যদি তাকে রাস্তা থেকেই তুলে আনা হয়। সেক্ষেত্রে তার আত্মীয়স্বজন আর জন্মস্থান সম্পর্কেও কিছু না লেখা থাকাও সম্ভব হতে পারে। অন্ততঃ আরও কিছু খবর থাকা অবশ্যই উচিত, বিশেষ করে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তারিখ।

একটু বিরক্ত বোধ করলেন ডাঃ ব্র্যাডেন। বিশেষ করে মানসিক রোগীর চিকিৎসায় নতুন একটা পদ্ধতি চালু হয়েছে, সেটা হল বিশেষ ধরনের 'শক ট্রিটমেণ্ট'। ডাঃ ব্র্যাডেন মিডভিলে কিংম্যানের উপর সেটা পরীক্ষা করায় উৎসাহী। অবশ্য এটা তখনই করার কথা যখন রোগীর কোন মতেই নিরাময়ের আশা থাকে না। ডাঃ ব্র্যাডেন রেকর্ড যে রাখে সেই কেরানীকে ডেকে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা জানাতে বললেন।

দুঘণ্টা পরে ডাঃ ব্র্যাডেন পাইপ টানতে টানতে একটা আমেরিকান চিকিৎসা সংক্রান্ত সাময়িক পত্রের পাতা উল্টে চলেছিলেন। সামনেই বসেছিল রাজকীয় ভঙ্গিতে জন কিংম্যান। দেহে সাধারণ রোগীর সস্তা দরের পোশাক —কারণ তার আত্মীয়-স্বজন কেউ পোশাক পাঠায় নি। কিংম্যানের বয়স হয়তো চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে কোনটাই হতে পারে। শূন্যে দৃষ্টি মেলে সে যেন ঈশ্বরের মতই কোন চিন্তায় মগ্ন। মানুষ বা মানুষের কোন কাজ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

ডাঃ ব্র্যাডেন পড়া শেষ করে জন কিংম্যানের দিকে তাকালেন। মানসিক রোগীদের নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঠিক শিশু আর প্রাণীর মত। ওদের চমকে না দিয়ে অনেক কিছুই তাই করাও যায়।

বেশ চিন্তা করেই এবার মুখ খুললেন ডাঃ ব্র্যাডেন, 'জন, ভাবছি তোমার সম্পর্কে কিছু একটা করব।'

কিংম্যান মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর দুচোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল সে মানুষের ধৃষ্টতা দেখে বেশ মজা উপভোগ করছে। মানুষ যে ওর সঙ্গে কথা বলার ধৃষ্টতা

[এর পরের অংশ 47 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

তুই কি জানিস, এই ব্যবসায়ীরা খাবারে রঙ লাগিয়ে লোভনীয় করে তুলে আমাদের জন-জীবনে কি বিপদ ডেকে আনছে?
হাজার লক্ষ কোটি লোক এই খাবার খাচ্ছে—এখন খাওয়াতে হবে কিনা অই ভুজুং ভাজাং দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিস ?
হাসপাতাল ডাক্তারখানাগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখগে যা, কত লোক কত রকম ব্যাধিতে ভুগছে আর তার কি উৎস।
দেখবি বেশীর ভাগ রোগই এই ভেজাল খাবারে ঘটিত। পেপারে এ নিয়ে অনেক হুঁশিয়ারী বেরিয়েছে। রঙ করা খাদ্য কতটা ক্ষতিকর।
এখন ক্ষতিটা বোধ-হয় তোরই বেশী!
না, ক্ষতিটা সবার!
রক্তাল্পতা, চোখের দৃষ্টিশক্তি নাশ, জন্ডিস, এক কথায় মানুষকে পঙ্গু করে দেয় এই রঙ। এরপর মৃত্যু তো আছেই।
তুই কি শেষমেষ আমাকে ভয় দেখিয়ে খাওয়া বন্ধ করাতে চাস?
ভয় নয়, নিজের কমনসেন্স। যাক রঙের নামগুলো শোন—আরেঞ্জ, মেটালিক ইয়েলো, ম্যাজেন্টা, কংগো রেড, ব্লু—
ব্যাস, ব্যাস থাম!
এ ছাড়া আরও আছে। তাই আমাদের উচিত এই সব খাবার বিষবৎ পরিত্যাগ করা।
কৃপণ!
রঙীন খাবারে বিষ আছে—খুদে আজকাল খুব টুপি পরাতে শিখেছে।

তোর মোদ্দা কথা হলে আমরা ঐ খাবার খাব না।
রাইট! এই তো তোর সুবুদ্ধি হয়েছে!
মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
ও রকম কিপটের কাছ থেকে না খাওয়াই ভাল।
তাহলে ঐ কোল্ড ড্রিঙ্ক একটা হয়ে যাক, মিনিমাম প্রাইস।
সর্বনাশ!
কি হলো! এতেও কান্নড়াচ্ছে?
ও তো সাক্ষাৎ যম!
ঠাণ্ডা পানীয়
প্রাথমিকভাবে এই পানীয় দেহ মন জুড়োয় ঠিকই, তবে ভিতরে ভিতরে তোর অজান্তে কি পরিমাণ শারীরিক ক্ষতি করে বুঝতে পারবি না।
আজকাল এই ভেজাল রঙ ডাল মাজি মশলা থেকে মাছের বাজারে এমন কি কসমেটিক দ্রব্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে!
সব রঙই তো আর বিষাক্ত নয়। ক'জন আর বিশুদ্ধ স্বাস্থ্য সম্মত রঙ ব্যবহার করে! ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লোভই হল এর মূল।
তোর মত কঞ্জুস যদি আর দুটো থাকতো – ব্যবসায়ীদের আর করে খেতে হত না।
খালি লেকচার। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা!

আমরা যদি এ ব্যাপারে সতর্ক হই ব্যবসায়ীদের সাধ্য কি যে ভেজাল রঙ দিয়ে মুনাফা লোটে!

ত-তুই একটা রঙবাজ, ধোঁকাবাজ কিপটে! পাঁচটা পয়সার জন্য এত তঞ্চকতা — ভবিষ্যতে আমিও এর বদলা নিয়ে নেব।
আমি-আমাকে তুই রঙবাজ বলছিস?

বল — খাওয়াবো না, কিংবা পয়সা নেই ব্যাস! তার জন্য এত রঙ দেখাবার কি আছে।

আর বেশী রঙ দেখাবি তো ঐ রঙ গলে মাথায় তেলে দেব!
তোকে আমি কখন রঙ দেখালুম!

বস্ত রঙই তো দেখানো হল, আবার বলে — রঙ দেখালুম কখন! ন্যাকা।

পয়সা নেই, খাওয়াবো না- আমি তো তা বলিনি। রঙ করা খাবার বাদে তুই অন্য কি খেতে চাস বল —
এবার রঙের বদলে ঢং দেখানো হচ্ছে ইস্টুপিড?

দেখলে তো আমার কথাটা কানে নেবার চেষ্টাই করলো না। উল্টে রঙ দেখিয়ে চলে গেল!
এ তো ভালই হয়েছে, নয় তো তোমার পাঁচের বদলে পঞ্চাশ পয়সা গচ্ছা দিতে হত।

ভারতের গণিত চর্চায় স্মরণীয় যাঁরা

চন্দন রুদ্র

প্রথম আর্যভট

বিখ্যাত আর্যভট ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম। গুপ্তযুগে পাটনার এক গ্রামে (কুসুমপুর) খুব সম্ভব 476 খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে 121টি শ্লোকে পাটীগণিত ও অন্যান্য গণিত, কাল ও ক্ষেত্রবিভাগ, গ্রহ ও গোলক সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ এই বইয়ে বিশুদ্ধ গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও তৎসংক্রান্ত গণিত আলোচিত হয়েছে। আর্যভট তাঁর বইতে 10 গুণোত্তর সংখ্যা 10^{18} পর্যন্ত ধরেছেন, এই বইতে বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়, সমান্তর শ্রেণীর যোগফল নির্ণয়, দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান, π-এর মান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তোমরা জেনে গর্ববোধ করবে যে ইনিই সর্বপ্রথম 'পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ ও আহ্নিক গতি'র কথা প্রচার করেন এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করেন। অক্ষর দ্বারা সংখ্যা প্রকাশের এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অনেকের মতে বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের অনুপাত (π) তিনিই সর্বপ্রথম নির্ণয় করেন। তিনি স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির বর্গসমূহের ও ঘনসমূহের যোগফল নির্ণয় প্রণালী নির্ধারণ করেন।

ব্রহ্মগুপ্ত

ব্রহ্মগুপ্ত ভারতের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও বীজগণিতাচার্য। অনেকের মতে তিনি 598 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারও মতে মুলতান প্রদেশে আবার কারও মতে উত্তর গুর্জরে তাঁর নিবাস ছিল। তাঁর রচিত 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি গণিত ও গোল জ্যোতিষ এবং পাটীগণিত ও বীজগণিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচিত বীজগণিত পরে আরব দেশের মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশে পৌঁছায়। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর পাটীগণিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রগতি, অংশ বিভাগ, সামতলিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে পরিমিতি, এবং আয়তন বিষয়ক সমাধান আলোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বীজগণিতে তিনি $x^2+Px-q=O$ এই আকারের দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের সূত্র হিসাবে দিয়েছেন, $x=\sqrt{\frac{P^2+4q}{2}}-P$, এটা থেকে অবশ্য একটি বীজ পাওয়া যায়।

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির তিনি দুই সেট মান দিয়েছেন; যথা—$2mn$, m^2-n^2, m^2+n^2 এবং $\sqrt{m}$, $\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}-n\right)$, $\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}+n\right)$.

তোমরা পরে জ্যামিতে ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য নামে একটি প্রয়োজনীয় উপপাদ্য পড়বে।

মহাবীরাচার্য

ইঁহার জন্মের সময় বা কাল এবং জন্মস্থান সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে ব্রহ্মগুপ্তের পরে ও শ্রীধরাচার্যের পূর্বে বলেই অনুমান করা হয়। তিনি মহীশূরে বসবাস করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'গণিত-সার-সংগ্রহ'। এই গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এই গ্রন্থে পাটীগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ইনি ভগ্নাংশের ভাগের নিয়মটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—'ভগ্নাংশের ভাগে ভাজকের লবকে হর ও হরকে লব করে লিখে তার সাহায্যে ভাজ্য ভগ্নাংশকে গুণ করতে হয়।

শ্রীধরাচার্য

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীধর সম্ভবতঃ 991 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে অনুমান করেন ইনি হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধরের পিতার নাম বলদেবাচার্য ও মাতার নাম অচ্ছোকা দেবী। ইহা স্মার্ত শ্রীধরাচার্য হতে ভিন্ন। শ্রীধরের রচিত গ্রন্থের নাম 'ত্রিশতিক' বা 'গণিত-সার'। ঐ গ্রন্থে তিনশত শ্লোক থাকায় উহার নামকরণ ত্রিশতিক। সংখ্যা গণনা, পরিমাপ, স্বাভাবিক সংখ্যা, গুণ, ভাগ, শূন্য, বর্গফল, ঘনফল, ভগ্নাংশ, ত্রৈরাশিক, সুদ নির্ণয়, যৌথ কারবার অর্থাৎ সঙ্ঘয় সমুত্থান ও পরিমিতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। হিন্দু আচার্যদের মধ্যে শূন্য (0) সম্বন্ধে শ্রীধরের বিবৃতিই সর্বাপেক্ষা বিশদ। তিনি লিখেছেন, 'কোন সংখ্যার সাথে শূন্য যোগ করলে যোগফল সেই সংখ্যাই হয়; যদি 0 বিয়োগ করা হয় তবে সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন হয় না; যদি 0-কে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তবে গুণফল শূন্যই হয়।' তিনি 0 দ্বারা ভাগ করা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কোন ভগ্নাংশকে ভাগ সম্বন্ধে তিনি ভাজকের অন্যোন্যক দ্বারা গুণ করার প্রণালী দিয়েছেন এবং তিনি বর্তমান π-এর পরিবর্তে $\sqrt{10}$

ব্যবহার করেছেন। দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের জন্য শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতি তোমাদের পড়তে হবে।

শ্রীধরই সর্বপ্রথম পাটীগণিত হতে বীজগণিতকে পৃথক করেন।

ভাস্করাচার্য

ভারতের অন্যতম জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য সম্ভবতঃ 1114 খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বিদার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য আনুমানিক 1150 খ্রিস্টাব্দে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ (1) লীলাবতী (পাটীগণিত ও পরিমিতি), (2 বীজগণিত, (3 গ্রহ গণিতাধ্যায় ও (4) গোলাধ্যায় এই চারিভাগে বিভক্ত। শেষ দুইটি গ্রন্থে তিনি বর্তুলের তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় পদ্ধতি, চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়, পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্ণনা করেছেন।

তিনি শূন্য দ্বারা কোন সংখ্যাকে ভাগ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা দেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিয়েছেন $10 \div 0 = \frac{10}{0}$ এবং $3 \div 0 = \frac{3}{0}$ এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ভগ্নাংশটিকে যার হর শূন্য, একটি অনন্ত রাশি বলা হয়।' তিনি বীজগণিতে অমূলদ সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। তিনি কাল্পনিক সংখ্যাকে স্থান না দিয়ে বলেছেন, 'কোন ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল হতে পারে না, কারণ ঐ রাশি কোন বর্গই নয়।' তাঁর গ্রন্থে সরল সমীকরণ ও দ্বিঘাত সমীকরণও আলোচনা করেছেন। পীথাগোরাসের সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য সূত্র দিয়েছেন এইরূপ ;

$$\sqrt{m}, \frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}-n\right), \frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}+n\right), \text{ বা, } m, \frac{2m}{n^2-1},$$

$$\frac{m(n^2+1)}{n^2-1} \text{ বা, } \frac{m(n^2-1)}{n^2+1}, \frac{2mn}{n^2-1}, m,$$

'লীলাবতী' গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। অনেকের মতে ভাস্করাচার্য তাঁর বিদুষী কন্যা লীলাবতীর নামে গ্রন্থটির নামকরণ করেন। আবার অনেকের মতে তাঁর কন্যা লীলাবতীই এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

সম্রাট আকবরের নির্দেশে 'লীলাবতী' গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

এর পরে তোমরা বড় হয়ে আরো অনেক প্রখ্যাত হিন্দু গণিতবিদ্দের জীবনী পড়ে গণিতের বহু বিষয় জানতে পারবে।

বাঁশদ্রোণী চাকদহ পেয়ারা বাগান, 24 পরগনা।

গাছপালা

শেওলার জন্মকথা

বগলা যোগশর্মা

আমাদের এ পৃথিবীতে কখন কোথায় কিভাবে শেওলার আবির্ভাব ঘটলো সে বিষয়েই আলোচনা করব। তার আগে কয়েকটি কথা বলি, শোন ঃ

পৃথিবীর জন্ম নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে মতভেদ আছে। তবে জন্মের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, তারপর প্রাণের প্রথম সাড়া জেগেছে আদিম পৃথিবীর উষ্ণ লোনা সাগরের জলে।

তবে পৃথিবীতে কবে কখন কোন জীবের যে আবির্ভাব ঘটেছিল তার কোন সঠিক দিন তারিখ আজ অবধি কোন বিজ্ঞানী হলফ করে বলতে পেরেছেন বলে তো শোনা যায় নি। তবে সময়ের একটা মাপকাঠির হদিশ তাঁরা দিয়েছেন। আর এও বলেছেন যে আদিম জলে প্রথম যে জীবাণুটির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল—যাদেরকে 'ট্রাইলোবাইট' বলা হতো, তারাই বিবর্তিত হতে হতে শেষে আজকের শেওলা নামধারী নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। আদিতে 'ট্রাইলোবাইট'-রাই ছিল উন্নত শ্রেণীর জীবাণু। আজকের দুনিয়ায় মানুষদের মত। এ সকল জীবাণুদের পেটের তলায় ছিল একটি থলির মত বস্তু। ঠেসে ঠেসে জল পুরে নিত থলিতে, তারপর সামনের দিকে তাক করে জলভর্তি থলিতে সজোরে চাপ দিত। চাপের ফলে থলি থেকে সবেগে জল বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই চলার প্রচণ্ড গতি পেতো এরা। এমনি ভাবে আজব কায়দায় সে সকল জীবাণুর দল সাগরের জল তোলপাড় করে বিচরণ করত।

সূর্যের আলো আর বৃষ্টির জল পেয়ে এ জাতীয় কিছু কিছু জীবাণুর দেহে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল দেখা দিল। যাদের শরীরে এ বস্তুটি তৈরি হলো, তারাই শুধু জলকে পুষ্টি বানিয়ে আর বাতাসের অফুরন্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে ভেঙে কার্বনকে দেহের কাজে লাগিয়ে বাকি অক্সিজেনটুকু বাইরের বাতাসে ছেড়ে দিতে পারতো। তখন থেকেই জীবাণু জগতে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দিল। এরাই পরে শেওলা থেকে শুরু করে সবুজ পাতাওয়ালা বিচিত্র উদ্ভিদ জগত গড়ে তুললো।

আনন্দপুরী, পোঃ নোনাচন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর 24 পরগণা।

নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং তারপর

মৃন্ময়ী দাস

নক্ষত্রের সৃষ্টি, বিবর্তন, বিলোপ—মহাকাশের চিরন্তন রহস্য। বিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্রেরও জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যু আছে। আমাদের চোখের সামনেই বিভিন্ন ছায়াপথে পুরনো তারার মৃত্যু হচ্ছে, জন্ম হচ্ছে নতুন নক্ষত্রের।

ব্রহ্মাণ্ডে নিয়তই গ্যাসপুঞ্জ যা প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস ও ধূলিকণার ঝড় বয়ে চলেছে। এদের ওপর কাজ করে দুটি প্রবল শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা তাদের প্রবলবেগে কেন্দ্রের দিকে টানছে এবং আবর্তন গতি থেকে উদ্ভূত কেন্দ্রের বিপরীতমুখী সেনট্রিফিউগ্যাল শক্তি, যা তাদের কেন্দ্রের বিপরীতে ঠেলে দিচ্ছে। যতক্ষণ এই দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সাম্যতা বজায় থাকে, ততক্ষণ কিছু ঘটে না। কিন্তু কোনও কারণে যদি এই দুটি বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তখনই এই গ্যাসপুঞ্জ ও ধূলিকণা ঘূর্ণি ঝড়ের মত কোনও কেন্দ্রের চারদিকে জমা হতে থাকে এবং গোলাকার রূপ নেয়; জন্ম হয় একটি নক্ষত্রের। নক্ষত্র সৃষ্টির এই প্রাথমিক পদক্ষেপের তথ্য এখন বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ভাবে মেনে নিয়েছেন।

পরের প্রসঙ্গ নক্ষত্রের বিবর্তন ও অন্তিম পরিণতি। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কিছু কিছু মতভেদ আছে। আমাদের সূর্য একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র। সূর্যকে দিয়েই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সূর্য একটি গ্যাসীয় গোলক, যার ব্যাস প্রায় 1390000 কিলোমিটার। সূর্যের তিনটি ভাগ। বাইরে আলোকময় বহিরাবরণ। তার নিচে গ্যাসীয় মণ্ডল, যার শতকরা 70 ভাগই হাইড্রোজেন ও 30 ভাগ হিলিয়াম ও সামান্য কিছু ভারী মৌলিক পদার্থ। এরও পর আছে সূর্যের কেন্দ্রীয় মণ্ডল। মাধ্যাকর্ষণের টানে গ্যাসীয় স্তর ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। এর ফলে কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড চাপ যা পৃথিবীর বায়ুচাপের প্রায় 2×10^9 গুণ বেশি। প্রচণ্ড চাপের ফলে তাপ বাড়তে থাকে, সূর্যের কেন্দ্রীয় মণ্ডলের তাপ গিয়ে দাঁড়ায় দেড়কোটি ডিগ্রী কেলাভিনের মত। এই প্রচণ্ড তাপের ফলে সূর্যের গ্যাসীয় স্তর সমপ্রসারিত হতে থাকে। ফলে সূর্যের আয়তন মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক থাকে।

সূর্যের এই উত্তাপের একটা অংশ গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে বাহির্জগতে বিকীর্ণ হয়। ফলে সূর্যের তাপমাত্রা কমতে থাকে। এভাবে চললে সৃষ্টির প্রায় দেড়কোটি বছরের মধ্যেই সূর্য তার উত্তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যেত। কিন্তু এই পরিণতির হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে আর এক রকমের বিক্রিয়া তাপ-পারমাণবিক সংযোজন। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা 4×10^{16} ডিগ্রী কেলভিনেরও বেশি। এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সংযোজনের ফলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়। বিকিরণের ফলে সূর্য যে শক্তি হারায় তা এইভাবে আবার ফিরে পায়। কিন্তু একদিন যখন এই হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে?

সূর্যের কেন্দ্রে উত্তাপ আবার কমবে এবং কেন্দ্রে সঙ্কোচন চলবে। সঙ্কোচনের ফলে সূর্যের কেন্দ্র যাবে চুপসে আর ম্যাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ্য করে তার গ্যাসীয় মণ্ডল সম্প্রসারিত হতে থাকবে। এর ফলে সূর্যের আয়তন একশ গুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং তাপমাত্রা আরও কমতে থাকবে। সূর্যের হলুদ সাদা উজ্জ্বল বর্ণ তখন হয়ে উঠবে রক্তাভ—এই ধরনের নক্ষত্রকে বলা হয় 'রেডজায়েণ্ট' বা লালদৈত্য। এরপরও চলবে কেন্দ্র সংকোচন। একটা সময়ে সৌরঝড়ের প্রভাবে সূর্যের চারপাশের গ্যাসীয় আবরণ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে এবং চুপসে যাওয়া কেন্দ্রবস্তুটি পরিণত হবে একটি শ্বেতশুভ্র নক্ষত্রে। যাকে বলা হয় 'হোয়াইট ডোয়াফ' বা শ্বেত বামন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে এটাই ছিল নক্ষত্রের অন্তিম পরিণতি।

ভারতীয় নোবেল বিজ্ঞানী স্যার সি. ভি. রমনের ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রশেখর 1930 সালে এই মতবাদের ওপর আঘাত হানলেন। তিনি বললেন শ্বেতবামন সব নক্ষত্রের অন্তিম দশা হতে পারে না। তাঁর মতে যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1·4 গুণ কি তারও বেশি, তাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণজনিত সঙ্কোচন ও ক্রমান্বয়ে বিকিরণ চলতেই থাকবে। ফলে তাদের আয়তন ক্রমাগত কমবে, ঘনত্ব বাড়বে। শেষে তাদের ব্যাস মাত্র কয়েক কিলোমিটার হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু ভর থাকবে আগের মতই। এই বস্তুটির ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে কল্পনাতীত বেশি এবং সেই নিরেট পরিমণ্ডল থেকে আলোক রশ্মিও বেরিয়ে আসতে পারবে না। এইভাবে নক্ষত্রটি হয়ে দাঁড়াবে একটি 'কালোবামন'। প্রায় 30 বছর পরে চন্দ্রশেখরের তত্ত্বের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। আবিষ্কৃত হয় অকল্পনীয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন নিরেট ক্ষুদ্রায়ব নক্ষত্র, নাম দেওয়া

হয় 'ব্ল্যাকহোল্' বা কৃষ্ণ গহ্বর। এই ব্লাকহোলই সেই 'কালো বামন'।

1953 সালে আমেরিকার জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ফাউলার তাঁর তত্ত্বে বলেন, নক্ষত্রের মধ্যে 10^7 ডিগ্রী কেলভিন উত্তাপে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় ও চাপ বাড়ে। হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হলে 10^8 ডিগ্রী কেলভিন উত্তাপে হিলিয়াম পারমাণবিক জ্বালানি হিসাবে কাজ করে, তৈরি হয় কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। তাপমাত্রা আরও বাড়ে। তখন একই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন, কার্বন থেকে তৈরি হয় নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, লোহা, সীসা, বিসমাথ প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থ। কখনও কখনও সংশ্লেষণের ফলে ভর কমতে কমতে নক্ষত্রটি এত ছোট হয়ে পড়ে, যার ফলে তার বাইরের ইলেকট্রন কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেয় নিউট্রন। এইভাবে নক্ষত্রটি 'নিউট্রন স্টারে' পরিণত হয়। আবার মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ চলার সময়ে কখনও কখনও নক্ষত্র তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। তখন হয় 'নোভা' বা 'সুপারনোভা' এক্সপ্লোশান অর্থাৎ নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ। এর ফলে নক্ষত্রের মধ্যেকার ঐ সব মৌল অণু মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর বিকীর্ণ হতে থাকা প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি এবং মহাজাগতিক রশ্মি।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি ● নিয়মাবলী

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু এজেন্টদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

প্রচার দপ্তর ঃ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান
86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

রেগুলেটার

অভিজিৎ মিত্র

পাখার রেগুলেটার কি করে কাজ করে জানা যাক ঃ

তোমরা জান বাইরের তড়িৎ—উৎসের দুই প্রান্তের সঙ্গে মোটরের আর্মেচারে যোগ হয়। আর নেগেটিভ তারের মধ্যেই রেগুলেটারটা জুড়ে দেওয়া হয়। রেগুলেটারের হাতলটি ঘুরিয়ে 1 থেকে 5 প্রভৃতি ঘরে নিয়ে গেলে, মোটরের তড়িৎপ্রবাহ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে, কিন্তু off স্থানে নিয়ে গেলে তড়িৎপ্রবাহ ছেদ ঘটে আর পাখা বন্ধ হয়।

যাক এবার ছবিটা দেখা যাক, ছবির উপরের দিকে কাটিমের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চারটি খণ্ডে তড়িৎরোধক তার দিয়ে জড়ানো থাকে। প্রথমে SR_1S_2, দ্বিতীয় খণ্ড $S_2R_2S_3$। এইভাবে S_5 পর্যন্ত ভাগ করা আছে। এখন বাইরের হাতলটার সঙ্গে যে ধাতব অংশের যোগ, তারই এক অংশ হলো P। হাতল ঘোরালে P, S_1—S_5 পর্যন্ত স্থানে জড়ানো তারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। রেগুলেটারে বিদ্যুৎ পজিটিভ 'A' প্রান্ত দিয়ে 'C' তে পৌঁছায়, আর 'C' থেকে S_5-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। 'P' অংশটি হাতলের মধ্যে দিয়ে 'D' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেগেটিভ প্রান্ত 'B' এর সহিত সংযোগ স্থাপন করে। তাহলে দেখ 'A' প্রান্ত হলো পজেটিভ আর 'B' হলো নেগেটিভ প্রান্ত। হাতল যখন off স্থানে থাকে তখন তড়িৎপ্রবাহ 'A' থেকে 'B' প্রান্তে যেতে পারে না। যার ফলে পাখাও চলে না। এবার হাতল ঘুরিয়ে 'S_1' স্থানে আনলে তড়িৎপ্রবাহ 'C' থেকে $S_5(R_4+R_3+R_2+R_1)S_1$ পথে নেগেটিভ প্রান্তে যাবে এবং তারের রোধের জন্য তড়িৎপ্রবাহ কমে যাবে। যার ফলে ঘূর্ণনের দ্রুতি কম হবে। এইরূপ হাতল ঘুরিয়ে 'S_2' আনলে তড়িৎ 'C' প্রান্ত থেকে $S_5(R_4+R_3+R_2)S_2$ পথে নেগেটিভ (D) প্রান্তে যাবে। প্রথম থেকে রোধ কম হবে, পাখাও একটু জোরে ঘুরবে। এইরূপ হাতলটা ঘুরিয়ে 1, 2, 3, 4, প্রভৃতি স্থানে নিলে এক একটি প্যাঁচানো তার খণ্ড কমে যাবে এবং তারের রোধও কম হবে, যার সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও পর পর বেড়ে যাবে। হাতলটা 'S_5' এর স্থানে এলে প্রবাহ 'C' হতে 'S_6' স্থান দিয়ে কোন রোধ অতিক্রম না করে নেগেটিভ প্রান্তে চলে যাবে, ফলে তড়িৎ সবচেয়ে বেশি হবে। পাখাও ঘুরবে সবচেয়ে জোরে তখন।

লিলিপুটের দেশে

রতন বড়ুয়া

এবার বোধাত্মানন্দ তার গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটু আশ্চর্য'ই হলো, কারণ অন্য সময় আশপাশে কিছু ফলমূলের গাছ দেখতে পেতো, সেখান থেকেই ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পন্ন করে আবার গুহায় ফিরে গিয়ে যোগ সাধনায় বসে যেতো; আজ জায়গাটা যেন পরিষ্কার মনে হচ্ছে, গাছগুলোই বা গেলো কোথায়? এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বোধাত্মানন্দ তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে এগিয়ে চললো খাদ্যের সন্ধানে।

বোধাত্মানন্দ মোক্ষ লাভের আশায় হিমালয়ের এই জনমানবহীন পর্বতের গুহায় এসে বসবাস শুরু করেছিল কতদিন হলো কে জানে? বোধাত্মানন্দ নিজেই ভুলে গেছে। কারণ ছ-মাসে একবার তার ধ্যানভঙ্গ হয়। এই সময়টাতে পৃথিবীর কোন উত্থান পতনের খবরই তিনি রাখেন না। এবার বোধহয় সময়টা বেশ দীর্ঘ'ই ছিল। নতুবা জায়গাটা বেশ নতুন লাগছে কেন? মনে হচ্ছে এখানে কোন মানুষের আগমন ঘটেছিল।

যাই হউক এখন ক্ষুধার চিন্তা মহাচিন্তা। কারণ ধ্যানে অর্থাৎ যোগে বসলে তখন ক্ষুধার কথা মনেই হয় না। এখন যেহেতু জেগে রয়েছেন সুতরাং কিছু খাবারের প্রয়োজন আছে। বোধাত্মানন্দ আনমনে পাহাড় থেকে নেমে সমতলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি তাঁর চেহারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

বোধাত্মানন্দকে দেখে মনে হচ্ছিল একটি জংলী দানব-বিশেষ। দীর্ঘদেহ, চুল দাড়িতে মুখমণ্ডল প্রায় ঢাকা পড়েছে। কোমরের নিচে একটি লাল চেলী ছাড়া শরীরে কোন বস্ত্র নেই।

হঠাৎ একটি কোলাহলের শব্দে বোধাত্মানন্দের চিন্তা-শক্তিতে ছেদ পড়ে। কিন্তু তিনি চারিদিকে তাকিয়ে কোন লোকজন দেখতে পেলেন না। হঠাৎ খেয়াল হলো নিচে যেন কিছু নড়ছে। বোধাত্মানন্দ বসে পড়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন সবই মানুষ। তবে ওদের উচ্চতা এক থেকে দেড় ফুটের বেশি নয়। বোধাত্মানন্দ নিজে সাড়ে ছয় ফুট লম্বা। ঐ বেঁটে লোকগুলো যেমন বোধাত্মা-নন্দকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি বোধাত্মনন্দও এ সমস্ত লোক'ক দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। এ কোন দেশে তিনি এলেন? ছোটবেলায় পড়া গালিভারের লিলিপুটের দেশের ভ্রমণ কাহিনী মনে পড়লো। কিন্তু বাস্তবে কি এটা সম্ভব?

একজনের চীৎকারে বোধাত্মানন্দ সম্বিত ফিরে পেলেন। এতক্ষণ লোকগুলো দূর থেকেই কোলাহল করছিল। এবার ওদের মধ্য থেকে একজন একটা বন্দুকের মতো কি যেন বোধাত্মানন্দের দিকে তাক করে কিছু বলছে। কথাগুলো কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, আবার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। তখন বোধাত্মানন্দ নিজেই চীৎকার করে বললেন—'আমার নাম বোধাত্মানন্দ, আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। তখন ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে নিয়ে একজন স্পষ্ট বাংলা ভাষায় বললো—'তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং কেন এসেছ?' বোধাত্মানন্দ

হেসে বললেন—'আমি পাহাড়ের গুহা থেকে নেমে এসেছি কিছু খাবারের সন্ধানে।'

—তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। পূর্বোক্ত বক্তার একথার পর কিছু লোক বোধাত্মানন্দকে চারিদিকে ঘিরে ফেলে এবং এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়; বোধাত্মানন্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন। এক সময় ওরা এসে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। বাড়ির বাইরে যে সাইনবোর্ড রয়েছে সেখানে কি ভাষায় লেখা রয়েছে বোধাত্মানন্দ কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ অক্ষরগুলো চেনা। বাঙলা, হিন্দি, উড়িয়া ইত্যাদি নানা অক্ষর রয়েছে। কিন্তু অর্থ বের করা যাচ্ছে না। তবে বাড়ি থেকে যারা বেরিয়ে এলো পোষাক দেখে পুলিস বলেই মনে হয়। এখন এটা যে থানা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলো।

এখানকার বাড়িগুলো এত ছোট যে সেখানে বোধাত্মানন্দের পক্ষে কিছুতেই প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কারণ বাড়ির উচ্চতা খুব বেশি হলে তিন থেকে চার ফুট হবে। এদিক সেদিক তাকিয়ে একটা উঁচু সমান জায়গা পেয়ে বোধাত্মানন্দ বসে পড়ে। আসলে উঁচু জায়গাটা হলো একটি বাড়ির পাকা খোলা ছাদ। তাই সবাই ভয়ে একবার বাড়ির দিকে একবার বোধাত্মানন্দের দিকে তাকাতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটি অসংখ্য লিলিপুট লোকে ভরে গেলো। কিছু লোক ছবি তুলতে শুরু করলে, দেখে মনে হয় এরা খবরের কাগজের লোক। ভীড় সামলাতে পুলিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার সাংবাদিকদের কিছু বললে ওরা সবাই বোধাত্মানন্দকে ছেড়ে এগিয়ে চললো। এখন পূর্বের সেই বাঙলা বলা লোকটি এসে বোধাত্মানন্দকে উঠতে অনুরোধ করে সাংবাদিকেরা কিছু জানতে চায়, তাই একটা সাংবাদিক সম্মেলনে যেতে হবে। এতক্ষণ বোধাত্মানন্দ অসহায়তার সাথে বিরক্ত বোধও করছিল। এবার কিছু কৌতূহলও হলো।

পুলিস বেষ্টনীর মধ্যে বোধাত্মানন্দ এগিয়ে চলেছে, যেতে যেতে বাঙলা বলা লোকটিকে কোলো তুলে নেয় এবং দুজনে আলাপ করতে করতে চলছিল। ইতিমধ্যে লোকটির নাম জানা হয়ে গেছে—ওর নাম কংক্রিট বোম্। একজন পুলিসের সি. আই. ডি। এখানে বাংলা ভাষা বিশেষ কেউ জানে না। এটা একটা প্রাচীন ভাষা! কংক্রীট সি. আই. ডি বিভাগে ঢোকার পূর্বে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার স্কুল থেকে বাংলা ভাষা শিখেছিল।

বোধাত্মানন্দ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে—বাঙলা ভাষা কত প্রাচীন?

—প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে এই ভাষা পূর্ব ভারতে এবং বাংলাদেশ নামে একটা রাজ্যে চলতো। কংক্রীট উত্তর দেয়।

পাঁচশ বছর শুনে বোধাত্মানন্দ একটু থমকে গেলে। তাহলে কি তার বয়স পাঁচশ অতিক্রম করেছে? উত্তেজনা প্রশমিত করে আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে সেই ভাষা লুপ্ত হলো কেন?

—আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে একজন ভাষাবিদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো, তিনিই সব বলতে পারবেন। এই বলে কংক্রিট নেমে গিয়ে একজনকে ডেকে নিয়ে আসে।

বোধাত্মানন্দ প্রশ্ন করে—বাঙলা ভাষা কত প্রাচীন?

ইতিমধ্যে পথে যেতে যেতে বোধাত্মানন্দ চারিদিকে তাকিয়ে দেখে শুধু মানুষ আর মানুষ। পিপীলিকার মতো লিলিপুট মানুষগুলো গাছের ডাল, বাড়ির ছাদ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। বাড়িঘরগুলো ছোট ছোট। এর মধ্যে নিজেকে দানবের মতো মনে হচ্ছে।

এবার কংক্রিট যে লোকটিকে নিয়ে আসে বোধাত্মানন্দ তাকেও কোলে তুলে নেয় এবং নাম জিজ্ঞেস করে।

লোকটি নাম বললো ভাষাণ সেন। ভাষাণ খুব স্পষ্ট বাঙলা বলছিল। নানা কথার পর বোধাত্মানন্দ বাঙলা ভাষার বিলুপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাষাণ বললো—প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভাষা নিয়ে জাতিতে জাতিতে খুব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিদ্বেষ ছড়াতো। তখন সমস্ত ভাষাভাষীর কিছু বুদ্ধিজীবি লোক মিলে এই নতুন ভাষার উদ্ভাবন করেন। এটা ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল। তাই এখানকার ভাষাকে পূর্বাঞ্চলীয় ভাঁষা বলে। এই ভাষা বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি প্রাচীন খণ্ড খণ্ড পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ভাষা থেকে উদ্ভূত। এখন ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক কোন রাজ্য নেই। সবই এ ধরনের উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল,পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল বলে খ্যাত। আমি ভাষা নিয়ে গবেষণা করি তাই পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন অধিকাংশ ভাষাই বলতে পারি।

এসব আলোচনার মধ্যেই এক সময় বোধাত্মানন্দ ও অন্যান্যরা একটি বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়িটি উচ্চতায় আট থেকে দশ ফুট হবে। এটা এখানকার হলঘর, সিনেমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়ে থাকে। বোধাত্মানন্দ এখানে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারলো, কারণ এখানকার দরজাগুলোও বাড়ির সাথে মানানসই বেশ বড় ;

ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে করতে বোধাত্মানন্দ ভাবতে থকে—কি করে এটা হতে পারে? পাঁচশত বৎসর পার হয়ে গেলো অথচ তিনি কিছুই জানেন না? পৃথিবীর এত বিবর্তন ঘটলো কি করে?

বোধাত্মানন্দ ভাষাণ সেনকে এখন কত সন জিজ্ঞেস করে, ভাষাণ উত্তর দেয়—'2490 খ্রিস্টাব্দ'।

ভেতরে প্রবেশ করে বোধাত্মানন্দ স্টেজেই বসে পড়ে, সামনের সিটগুলোতে সাংবাদিকেরা বসে। দোভাষীর কাজ করার জন্য ভাষাণ পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। একজন সাংবাদিক স্টেজে উঠে এসে পরিচয় দিলেন দিল্লীর সাংবাদিক বলে।

বোধাত্মানন্দ পাল্টা প্রশ্ন করেন আপনি কি এখন দিল্লী থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ, মিনিট দুয়েক হলো দিল্লী থেকে এসেছি।

—কেন এসেছেন?

—আপনাকে দেখার জন্যে।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে?

—কেন! রকেটে!

—রকেট? এটা কি কোন দ্রুতগামী প্লেন?

—আজ্ঞে না, ওসব ট্রেন বা প্লেন পাঁচশ বছর আগের জিনিস। এখন হলো রকেটযান। যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মাত্র কয়েক মিনিটেই পৌঁছানো যায়।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলুনতো।

—যেমন ধরুন আমি 'লণ্ডনে' চাকরি করি। সকালের রকেটে চলে গেলাম, কাজ সেরে বিকেলের রকেটে দিল্লী ফিরে এলাম। যেমন এখন আপনার ইন্টারভিউ সেরেই যেতে হবে টোকিওর একটি সংবাদ কভার করতে।

এমন সময় অপর একজন সাংবাদিক উঠে এসে বোধাত্মানন্দকে তার এ ধরনের দেহাকৃতির কারণ জিজ্ঞেস করলে বোধাত্মানন্দ আশ্চর্য হয়ে বললেন—এতো স্বাভাবিক আকৃতি। বরং আপনাদের আকৃতিটাই অস্বাভাবিক। মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি তো আমার মতোই হওয়া উচিত।

—সে কি করে সম্ভব? মানুষের বর্তমান স্বাভাবিক উচ্চতা এক থেকে দেড় ফুট। অবশ্য আমরা নানা প্রাচীন গ্রন্থে পেয়েছি যে তখনকার মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা ছিল পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট। তবে বর্তমানে আমাদের কাছে সেটা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই আপনাকে দেখে বিভ্রম হচ্ছে, আপনি কি সত্যিই মানুষ?

এবার বোধাত্মানন্দ একটু বিরক্ত বোধ করেন এবং উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় বলতে শুরু করে—হ্যাঁ, আমিও মানুষ। তবে আমার জন্ম হয়েছিল সম্ভবত! পাঁচশত বৎসরেরও আগে। এর মধ্যে পৃথিবীর এত বিবর্তন ঘটে গেছে আমি জানতাম না। তবে তখনকার সাংসারিক জীবনেই আমি দেখেছি যে মানুষের আকৃতি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। হয়তো আপনাদের আজকের পরিণতি তারই বিবর্তনের ফল। অবশ্য আমার উচ্চতা তখনকার সময়েই স্বাভাবিকের চেয়ে একটু উচ্চ ছিল। আমি 'যোগ অভ্যাস' নামক এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পর্বতের গুহায় ধ্যানস্থ ছিলাম। ছ'মাস বা বৎসরান্তে একবার গুহার বাইরে এসে ফলমূল সংগ্রহ করে আবার গুহায় ফিরে যেতাম। এবার গুহার আশেপাশে কিছু না পেয়ে নিচে নেমে এসেই বিপত্তি ঘটেছে। অনুগ্রহ করে আমাকে গুহায় ফিরে যেতে দিন।

এবার যিনি স্টেজে উঠে এলেন তিনি হলেন একজন বৈজ্ঞানিক, নাম সায়েন থাম। তিনি মূলত সাংবাদিকদের অনুরোধেই এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে স্টেজে উঠে এলেন।

সায়েন থাম ভাষাণ সেনের কাছ থেকে বোধাত্মানন্দের নাম জেনে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন স্টেজে যে দীর্ঘাকৃতি লোকটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইনিও মানুষ, আমাদেরই মতো, ওর নাম বোধাত্মানন্দ। আমাদের আজকের পরিণতি ঐ বোধাত্মানন্দের আমল থেকেই বিবর্তনের ফল। তবে বোধাত্মানন্দকে এই বিবর্তন স্পর্শ করেনি কারণ ইনি এই বিবর্তন শুরুর পূর্বেই জন্মে-ছিলেন। তখন মানুষের আকৃতি এই বোধাত্মানন্দের

মতোই ছিল। তবে তাঁর এতদিন বেঁচে থাকার কারণ যোগ অভ্যাস। প্রাচীনকালে যোগ-অভ্যাস করে বহুলোক দীর্ঘায়ু লাভ করতো। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত শরীরের সমস্ত যন্ত্রাংশ বন্ধ রেখে দীর্ঘদিন পর পর চালনা করার ফলে শরীরের যন্ত্রাংশের স্থায়িত্ব বেড়ে যায় এবং মানুষ দীর্ঘজীবী হতে সক্ষম হয়। সে যাই হোক, আজকে আমাদের লিলিপুটের যুগে আমাদের পূর্বপুরুষ বোধাত্মানন্দকে সশরীরে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি ও তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হওয়া আমাদের কর্তব্য।

তখন সরকার পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হলো যে—এই শ্রদ্ধেয় পূর্ব পুরুষকে সর্বরকম সাহায্য করতে সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প এবং বোধাত্মানন্দজী যাতে গুহায় গিয়ে কোন প্রকার অসুবিধা অনুভব না করেন তার জন্যে ধ্যানের উপযোগী নির্জন পরিবেশের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হবে। শুধু বৎসরান্তে অন্তত একদিন যেন বোধাত্মানন্দজী তাঁর বংশধরদের দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন।

এর পর বিরাট শোভাযাত্রা করে বোধাত্মানন্দকে খাদ্য পানীয় সহযোগে গুহায় ফিরিয়ে দিয়ে আসা হয়।

Near Carmel School, P.O. Digboi, Assam, 786171

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এজেন্টদের প্রতি

- শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান বেরোবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।
- আনুমানিক মূল্য 25·00
- সংখ্যা পিছু 5/ টাকা অগ্রিম সহ 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে দপ্তরে অর্ডার পাঠাতে হবে।

প্রচার দপ্তর : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

উচ্চ মাধ্যমিক
ছাত্রছাত্রীদের মনের
মতো বই

অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকাদের
গঠনমূলক নির্দেশ ও সমালোচনায় রচিত
উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন
(১ম ও ২য়) খন্ড
প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত ও শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ☐ H.S., J.E., I.I.T পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর
- ☐ প্রায় দু'হাজার কষা অংক
- ☐ সংক্ষিপ্ত ও বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী এবং উত্তর
- ☐ বল তো কেমন করে হয় ?
- ☐ কি ঘটে বল তো ?
- ☐ কোনটি বল তো ?
- ☐ কিরূপ বল তো ?
- ☐ সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির নাম বল তো ?
- ☐ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয় পরিশিষ্ট

দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯
পোঃ বক্সঃ 10836 • গ্রাম BHALOBOI

দুই ঃ বন থেকে বেরোল বর্বর

এই পাণ্ডুলিপি নিজেকে বাঁচানোর জন্যে লিখছি না। করাল আতঙ্কটা যেন অন্যের ক্ষেত্রে সর্বনাশের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, তাই এই হুঁশিয়ারি। মানুষ জাতটা শেষ হতে চলেছে।

আমার নাম ইউলিসি মেরো। স্পেসশিপে চেপে আবার পাড়ি দিয়েছি মহাশূন্যের বুকে। বছর কয়েক যেতে পারব এইভাবে। সব্জী, ফল, ডিম আর মুরগীর মাংসের অভাব হবে না। অভাব কিছুরই নেই। হয়ত একদিন কোনো বন্ধু গ্রহে পৌঁছোতেও পারব। অথবা হয়ত আশা দুরাশাই থেকে যাবে। কিন্তু প্রতিবেদন লেখাই আমার পেশা। তাই লিখে যাচ্ছি আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের অবিশ্বাস্য প্রতিবেদন।

2500 সালে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে মহাজাগতিক জাহাজে চেপেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল অতি দানবিক নক্ষত্র বেটেলগুজ অণ্ডাল টহল দিয়ে আসব।

পৃথিবীর কেউ কখনও এ ধরনের অভিযানের কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য বেটেলগুজকে বলেন আলফা ওরিওনিস। পৃথিবী থেকে দূরত্ব তিনশ আলোকবর্ষ। বেটেলগুজের অভিনবত্ব অনেকগুলো কারণে। প্রথম তার সাইজঃ ব্যাস আমাদের সূর্যের ব্যাসের চেয়ে তিন থেকে চারশ গুণ বড়; তার মানে, বেটেলগুজের কেন্দ্র আর আমাদের সূর্যের কেন্দ্র যদি এক জায়গায় থাকে, তাহলে এই দানব গিয়ে ঠেকবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর ঔজ্জ্বল্যঃ ওরিয়ন নক্ষত্র সমাবেশে এর চাইতে উজ্জ্বল নক্ষত্র আর নেই, খালি চোখেই দেখা যায় পৃথিবী থেকে। তৃতীয় অভিনবত্ব, বেটেলগুজের রশ্মি; অপূর্ব লাল আর কমলা রঙের রশ্মি ঠিকরে দেয় মহাশূন্যে। সবচেয়ে বড় কারণটা এর দ্যুতি। কখনও একইভাবে ঝকঝক করছে না। ঋতু অনুসারে কখনো কমছে, কখনো বাড়ছে। ব্যাস কমা বাড়ার জন্যে এইরকম হচ্ছে। এককথায় বেটেলগুজকে বলা যায় ধুকধুকে তারা।

সৌরজগৎকে চষে ফেলার পর, বেশ কয়েকটা গ্রহে বসবাস শুরু করার পর প্রথম আন্তঃনক্ষত্র অভিযানে এতদূরের নক্ষত্রকে পছন্দ করা হলো কেন, এই নিয়ে প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল বিজ্ঞানীমহলে। সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন কিন্তু একজনই—প্রফেসর অ্যাণ্টেলে। অতিশয় পণ্ডিত মানুষ। শুধু সিদ্ধান্তই নেন না, পুরো অভিযানটাকে সংগঠন করেছিলেন একা, মনের মত করে স্পেসশিপের ডিজাইন এঁকেছিলেন নিজেই এবং তদারকি করে নির্মাণ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে। টাকার জন্যে কারো কাছে হাত পাতেন নি। ঐ বস্তুটি তাঁর অন্তত নেই। বিপুল অর্থব্যয় করে গেছেন একটি মাত্র খেয়ালের পিছনে। খেয়ালের কারণটা শুধু আমাকেই বলেছিলেন—মহাশূন্যে পাড়ি জমানোর পর।

বলেছিলেন—"ওহে ইউলিসি, প্রক্সিমা সেণ্টরী খুবই কাছের তারা। সেখানে গেলেই হত সবাই বলছে। বেটেলগুজ অনেক দূরের তারা। সেখানে গেলেই বা ক্ষতি কি? ঝামেলা এমন কিছু বেশি নয়—সময়? খুব বেশি লাগবে না।"

"বলছেন কী!" চোখ কপালে তুলে আমি বলেছিলাম—"প্রক্সিমা সেণ্টরী তো মোটে চার আলোকবর্ষ দূরে—কিন্তু বেটেলগুজ……"

"তিনশ আলোকবর্ষ দূরে। পৌঁছতে লাগবে দু-

বছরের সামান্য বেশি সময়। প্রক্সিমা সেণ্টরীতে পেঁছতেও লাগবে প্রায় একই সময়। বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

"আজ্ঞে—"

"বৎস ইউলিসি, এই যে রকেট চেপে তুমি উড়ে চলেছ, যে রকেটের ডিজাইন আমার নিজের—এর গতিবেগ কত জান্য ?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি।

মুচকি হেসে উনি বললেন—"আলোর গতিবেগ—এপসিলোন বাদে।"

"এপসিলোন ?"

"মানে, আলোর গতিবেগের খুব কাছাকাছি গিয়েও একটু ফাঁক থেকে যাবে—ধরো, দশলক্ষ ভাগের এক হাজার ভাগ। তাকেই বলছি এপসিলোন। ইউলিসি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোনো বস্তু আজ পর্যন্ত এত স্পীডে ছুটে যেতে পারে নি।"

"বুঝলাম।"

"চমৎকার! তাহলে আরো একটা ব্যাপার বুঝে রাখো। এই স্পীডে ছুটে চললেই পৃথিবীর সময় থেকে আমাদের সময় অন্য দিকে মোড় নেবে। এখনও তেমন স্পীড ওঠেনি। কথা বললাম তোমার সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিট—পৃথিবীতে কিন্তু এতক্ষণে কয়েকটা মাস কেটে গেছে। টপ স্পীডে যখন যাব, আমাদের ক্ষেত্রে সময় প্রায় থেমেই যাবে। তখন তোমার আর আমার কাছে যা কয়েকটা নিছক সেকেণ্ড, কয়েকটা মামুলি হৃদ্‌স্পন্দন—পৃথিবীতে তা কয়েক বছরের সমান হয়ে দাঁড়াবে।"

"তা তো বটেই। নইলে আমাদের মড়াগুলোই পেঁছোতো বেটেলগুজে। কিন্তু প্রফেসর "

"বল ইউলিসি।"

"দু বছর সময় নিচ্ছেন কেন ? কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টায় পেঁছোনো যাবে না কেন ?"

"কারণ যে স্পীডে উঠলে সময় প্রায় দাঁড়িয়ে যাবে, সে স্পীড তুলতে সময় লাগবে প্রায় এক বছর। দেহের যন্ত্র-গুলোকে সইয়ে নিতে হবে তো। আরও এক বছর লাগবে সেই স্পীড কমিয়ে সাধারণ স্পীডে আসতে। মাঝখানে পাব মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। ঐ ক' ঘণ্টাতেই পেরিয়ে যাব বেশির ভাগ পথ। এখন বুঝলে কেন প্রক্সিমা সেণ্টরীর বদলে বেটেলগুজ যাচ্ছি ?"

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম।

প্রফেসর অ্যাণ্টেলে হেসে বললেন—"এদিকে এক বছর, ওদিকে এক বছর—মাঝে মাত্র কয়েক মিনিট পেতাম প্রক্সিমা সেণ্টরীর জন্যে। তাই ভেবে দেখলাম, স্পীড তুলতে আর নামাতে যখন দু-দুটো বছর খরচ করছি, তখন বেশির ভাগ পথ পাড়ি দেওয়ার জন্যে কয়েকটা মিনিট কেন, কয়েকটা

পৃথিবী ছেড়ে আসার দু-বছর পর স্পর্শ করলাম আর এক গ্রহের মাটি

ঘণ্টাই খরচ করা যাক। অনায়াসেই পৌঁছে যাব বেটেলগুজে—হয়ত দেখব এমন একটা জগৎ যে জগতের সঙ্গে কোনো মিলই নেই আমাদের জগতের।"

অবসর পেলেই এই ধরনের কথাবার্তায় মশগুল থাকতাম আমি আর প্রফেসর। লীডার বটে একখানা! জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঠাসা! অথচ কি অমায়িক। সামান্য সাংবাদিক আমি। অথচ স্নেহভরে কত কঠিন ব্যাপার কি সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন। রকেটে দুবছর মানে যে পৃথিবীর সাড়ে তিনশ বছর এবং ফিরে আসার পর দেখা যাবে, সাতশ থেকে আটশ বছর বয়স বেড়ে গেছে পৃথিবীর—এই সব তত্ত্ব হাসতে হাসতে বলতেন বৃদ্ধ। সাত আটশ বছর পরে পৃথিবীটা কি রকম হবে, দেখার জন্যে পাগল ছিলেন প্রফেসর।

না, কোনো বিঘ্ন ঘটেনি যাত্রাপথে। রওনা হয়েছিলাম চাঁদ থেকে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল পৃথিবী আর অন্য গ্রহগুলো। ছোট হতে হতে সূর্য হয়ে গেল ছোট্ট একটা কমলা লেবুর মত, তারপর এক কণা আলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। নেহাৎই একটা তারকা। অগণিত তারকার মধ্যে আমাদের তারকা সূর্যকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু ছিল শুধু প্রফেসরেরই।

সূর্য বিহনেই কাটিয়েছি দিনগুলো। নকল আলো রকেটের মধ্যে থাকায় অসুবিধে হয় নি। একঘেয়েও লাগেনি। প্রফেসর আসর জমাতে ওস্তাদ। এই দু'বছরে তাঁর কাছে যা শিখেছি, তা জন্ম ইস্তক শিখিনি। কি করে মহাকাশ জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাও শিখিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর। খুব সহজ। কয়েকটা ইলেকট্রনিক মেশিনকে হুকুম দিয়েই খালাস। হিসেব তারাই করবে। স্পেসশিপ সেইভাবে চলবে।

রকেট জাহাজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর বাগান। প্রফেসরের বড় প্রিয় জায়গা। ফল, ফুল, সব্জী পৃথিবীর বাইরে চড় চড় করে বাড়ে কিনা দেখবার জন্যেই বাগানের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রফেসর। দু মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল বাগান ঝলমল করছে। ফলমূল, তরি-তরকারী, ফুলটুলের অভাব নেই। প্রজাপতি উড়ছে, পাখি গান গাইছে, গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে বাঁদর।

একটা বাঁদর। নাম তাঁর হেক্টর। প্রফেসরই এনেছিলেন সঙ্গে—পাখি আর প্রজাপতির সঙ্গে।

বাগান ছাড়াও রকেট জাহাজে জায়গা ছিল অনেক। বেশ কয়েকটা ফ্যামিলির থাকার ব্যবস্থাও ছিল। প্রফেসর কিন্তু কাউকে উঠতেই দেন নি ভেতরে। মানুষের ওপর যেন বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় বলতেন—"মানুষের দিন ফুরিয়ে এসেছে!"

কেন বলতেন, তা জানি না। অতবড় রকেট জাহাজে ছিলাম আমরা মোটে তিনজন—প্রফেসর, আমি আর আর্থার লেভেন। প্রফেসর বৈজ্ঞানিক। আমি সাংবাদিক বিয়ে-থা করিনি, ভাল দাবা খেলতে পারি—অতএব প্রফেসরের মনে ধরে ছিল আমাকে। আর্থার লেভেন তাঁর ছাত্র—পেশায় ডাক্তার। অল্প বয়স।

নির্বিঘ্নে তিনশ আলোকবর্ষ পেরিয়ে একদিন পৌঁছালাম বেটেলগুজে। দেখলাম তার আকাশজোড়া অপরূপ ঝলমলে আকৃতি।

ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিত হয়েছিলাম সেই দৃশ্য দেখে। বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। এই সেদিনও যে নক্ষত্রকে দেখেছিলাম অগণিত তারার মধ্যে এক কণা তারার মত, সেই নক্ষত্র এখন এসে গেছে সামনে। বড় হয়ে উঠছে একটু একটু করে। প্রথমে বাদামের মত, তারপর কমলালেবুর মত। তারপর যেন অবিকল আমাদের সূর্যের মতই দাঁড়াল তার ব্যাস। লালচে সূর্য—পৃথিবীতে অস্তগামী সূর্যের মতই নতুন এক সূর্য জন্ম নিল যেন চোখের সামনে।

গতিবেগ কমেই এসেছিল। আরও এগিয়ে গেলাম বেটেলগুজের দিকে। এত বড় ব্যাসের জ্যোতিষ্ক এর আগে কখনো দেখিনি। রোবটদের হুকুম দিলেন প্রফেসর। অতি-দানব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিল আমাদের রকেটযান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি বের করে পর্যবেক্ষণ করতে বসলেন বৈজ্ঞানিক।

অচিরেই আবিষ্কার করলেন চারটে গ্রহকে। কেন্দ্রের নক্ষত্র থেকে কোনটা কত দূরে রয়েছে, তাও জানা হয়ে গেল। এদের মধ্যে একটা, বেটেলগুজের তৃতীয় গ্রহ, ছুটছে আমাদের সমান্তরাল পথে। সাইজে প্রায় পৃথিবীর মতই। বাতাসে রয়েছে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন। সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব, তার তিরিশগুণ দূরে রয়েছে এই গ্রহ। ফলে নক্ষত্রের কিরণ যেটুকু পাচ্ছে, তা পৃথিবীতে পাওয়া সূর্যকিরণের সমান। তাপমাত্রা সেই-কারণেই গা-সওয়া।

ঠিক করলাম, প্রথমে অভিযান চালাব এই গ্রহেই। নতুন হুকুম চলে গেল রোবটদের কাছে। রকেটযান প্রদক্ষিণ শুরু করল নতুন এই গ্রহকে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতেই কক্ষপথে থেকে গিয়ে গ্রহ ঘিরে পাক দিতে লাগল নিজে থেকেই। টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ধীরে সুস্থে দেখতে লাগলাম নতুন গ্রহের মহাসাগর আর মহাদেশ।

এতবড় রকেটযানকে মাটিতে নামানো সম্ভব নয়। তিনটি ছোট লঞ্চ ছিল এই উদ্দেশ্যেই। ছোট সাইজের রকেট মেশিন। উঠে বসলাম একটার মধ্যে। সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি রইল সঙ্গে। পরনে মহাকাশের পোশাক। শিল্পাঞ্জী হেক্টরও মহাকাশের পোশাক গায়ে চাপিয়ে এসে বসল পাশে। বেরিয়ে এলাম লঞ্চ নিয়ে রকেটযান ছেড়ে। কেউ রইল না ভেতরে। রোবটরা ছাড়া। ওরাই কক্ষপথে

রেখে দেবে রকেটযানকে। এক ইঞ্চি সরে যাবে না। নোঙর ফেলে জাহাজ আটকে রাখার চাইতেও ভাল ব্যবস্থা।

এ ধরনের গ্রহে লঞ্চ নামানো খুবই সহজ ব্যাপার। পুরু আবহমণ্ডল ভেদ করে আসবার পরেই প্রফেসর বাইরের বাতাসের নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করলেন। পৃথিবীর বাতাসে যে উষ্ণতায় যে উপাদান থাকে, এখানেও রয়েছে ঠিক তাই। অদ্ভুত মিলটা নিয়ে ভাববার সময় তখন ছিল না। মাটি ক্রমশ ওপরের দিকে ধেয়ে আসছে। আর বড় জোর মাইল পঞ্চাশ। পোর্টহোলে মুখ ঠেকিয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলাম দ্রুতবেগে ওপর দিকে উঠে আসা নয়া দুনিয়ার দিকে। উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে রইলাম।

পৃথিবীর সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে এই গ্রহের। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে আরও প্রকট হচ্ছে এই সাদৃশ্য। খালি চোখেই এখন দেখতে পাচ্ছি মহাদেশগুলোর উপকূল। আবহমণ্ডল ঝকঝকে, সামান্য নীলাভ বাষ্প রয়েছে চারপাশে, মাঝে মাঝে তা কমলা-রঙীন হয়ে উঠেছে—দেশে থাকতে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে যেমন দেখেছি, ঠিক তেমনি। মহাসমুদ্রও হাল্কা নীল রঙের—মাঝে মধ্যে সবুজের আভা। উপকূল রেখা কিন্তু একেবারেই অচেনা। ভৌগোলিক মিল নেই কোথাও। প্রাচীন পৃথিবীর ম্যাপ মনে আছে, বর্তমান পৃথিবীকেও চিনি—কিন্তু এ গ্রহের কোনো মহাদেশই আমাদের পৃথিবীর মত নয়।

মিল একেবারেই নেই, তাই বা বলি কি করে! পৃথিবীর মত এ গ্রহেও বাড়িঘরদোর রয়েছে দেখতে পেলাম একটা শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে।

কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে লঞ্চ নামানো দরকার। তাই শহর টপকে এসে পড়লাম চাষের জমির ওপর। তারপর ঘন জঙ্গলের ওপর। নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে রকম দুর্ভেদ্য অরণ্য দেখা যায় পৃথিবীতে, ঠিক তেমনি। খুব নিচু দিয়ে তখন উড়ে চলেছি। চোখে পড়ল একটা মালভূমি। মালভূমির মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটা খোলা জায়গা। চারদিকের জমি কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো। প্রফেসর ঠিক করলেন, এইখানেই লঞ্চ নামাবেন। রোবটদের হুকুম দিলেন সেইভাবে। চালু হয়ে গেল রেট্রো-রকেট। খোলা চত্বরে ভেসে রইলাম সেকেণ্ড কয়েক।

তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলাম মালভূমির ঠিক মাঝখানে—পৃথিবী ছেড়ে আসার দু-বছর পর স্পর্শ করলাম আর-এক গ্রহের মাটি। না, এতটুকু ঝাঁকুনি লাগেনি। নরম্যানডিতে যে রকম সবুজ ঘাস দেখেছি, দু চোখ ভরে সেই রকম সবুজ ঘাস দেখতে লাগলাম লঞ্চের চারপাশে।

আগামী সংখ্যায় ঃ কার পায়ের ছাপ ?

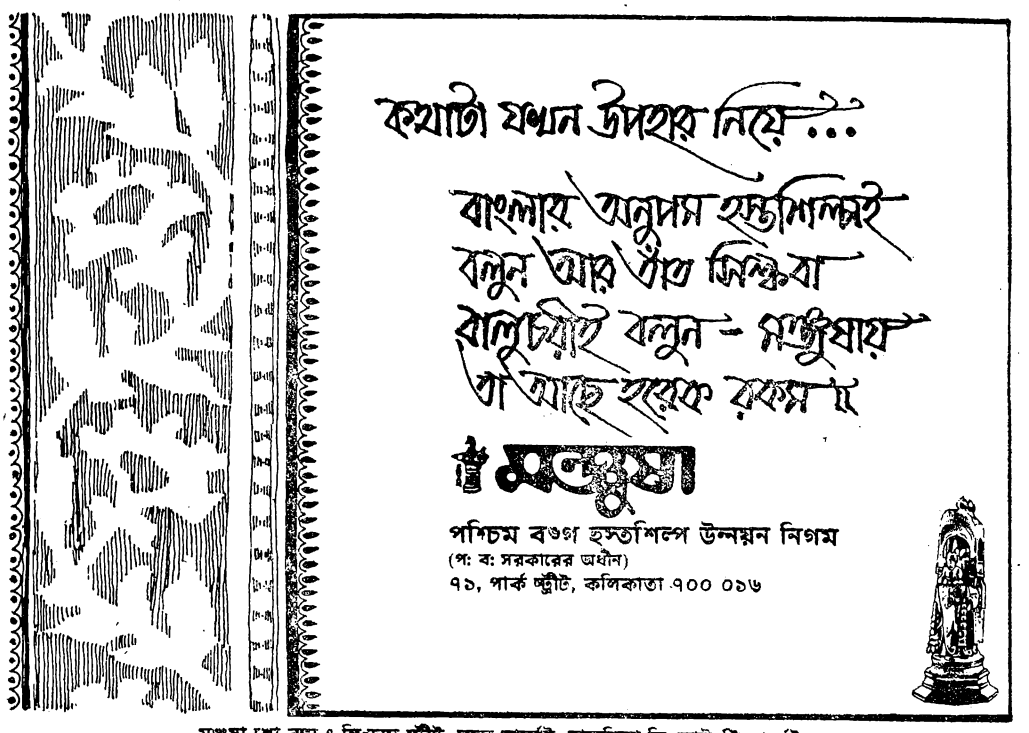

মঞ্জুষা শো রুম ঃ লিণ্ডসে স্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া সি-আই-টি মার্কেট, হাওড়া সাবওয়ে, দমদম এয়ারপোর্ট, বারুইপুর, সিউরি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বোলপুর, হলদিয়া, দার্জিলিঙ, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, মালদা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, জয়পুর।

DIOR 4186

পৃথিবীকে দেখা

সুবীর দত্ত

দেয়ালে টাঙানো দাদুর ছবিটা দেখিয়ে দিদিমা প্রায়ই আক্ষেপ করতেন 'মুখপোড়ারা ঠিকমতো ছবি তুললে তোরা তোদের দাদুর পুরো চেহারাটা দেখতে পেতি। কত লম্বা ছিলেন তিনি।' দিদিমাকে কি করে বোঝাবো যে একটু দূর থেকে ছবি তুললেই দাদুর মুখটা শুধু না এসে পুরো চেহারাটাই ছবিতে ধরা পড়ত। আরও দূরে দাঁড়িয়ে তুললে পেছনে আমাদের দেশের বাড়িটাও দেখা যেত। তবে তাতে দাদুর মুখটা এ্যাতো স্পষ্ট দেখাতো না। ক্যামেরা ভাল হলে, লেন্স জোরদার হলে সবটাই আবার অনেক স্পষ্ট দেখা যেত। অর্থাৎ, মোদ্দা কথা, যত দূরে যাব তত বেশি জায়গা আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়বে। আর, উঁচুতে দাঁড়ালে আরও বেশি।

খুব ভাল আবহাওয়ায় উঁচু পাহাড়ের চূড়াতে দাঁড়িয়ে খুব শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যেও 5000 বর্গমাইলের বেশি অঞ্চল দেখা সম্ভব না। অথচ সারা পৃথিবীর জল ও স্থল মিলিয়ে মোট ক্ষেত্রফল হল প্রায় 20 কোটি বর্গমাইল। তাই গোটা পৃথিবীকে বা তার এক বড় অংশকে দেখতে হলে বা তার ছবি পেতে গেলে যে মানুষকে শক্তিশালী যন্ত্রপাতি নিয়ে ঐ আকাশের চূড়ায় উঠতে হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ থেকে দুশো বছর আগে এখানে বসে পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের নক্সা তৈরি করা অনেক সহজ কাজ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে গরম বাতাস বা হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুনের সাহায্যে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করা এবং তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরোপ্লেন থেকে ছবি তোলা এবং এভাবে এগিয়ে এসে গত 20 বছরে মানুষ মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা ও মাপজোক করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। গোটা বিশ্বকে একসাথে দেখতে পারছে।

1968 সালে এ্যাপোলো মহাকাশযানের মহাকাশচারীর হাতে ধরা ক্যামেরায় পৃথিবীর ছবি ধরা পড়ে। পৃথিবীর মানুষ গোটা পৃথিবীকে একসাথে দেখতে পায়—যা আগে কখনও হয়নি। 1960 থেকে 1971 সাল পর্যন্ত নানা মহাকাশযান থেকে, হরেকরকম ক্যামেরায়, বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ছবি তোলা হয়েছে। নানা দিনে। 1965 সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'নাসা' পৃথিবীর সম্পদ জরিপ করার উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক কর্মসূচী স্থির করেন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী 1972 সালের 23শে জুলাই ল্যান্ডস্যাট্—1 মহাকাশযান (আগের নাম ই. আর. টি. এস.—1) মহাকাশে ছাড়া হয়। এই মহাকাশযান 1979 সাল পর্যন্ত কাজ করে। 1975 সালের জানুয়ারী মাসে ল্যান্ডস্যাট—2 এবং 1978 সালের মার্চ মাসে ল্যান্ডস্যাট্—3 মহাকাশে ছাড়া হয়।

প্রথম যখন ল্যান্ডস্যাট্—1 এর মাধ্যমে পৃথিবীর ছবি পৃথিবীতে বসেই দেখা গেল, তখন সারা বিশ্বে বিপুল উত্তেজনা। দেখা গেল এ্যাপোলোর তোলা ছবির বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা মিলছে।

ল্যান্ডস্যাট্ একটি ছোট মহাকাশযান। এক টন ওজন। এটা পৃথিবীকে প্রতি 103 মিনিটে একবার করে প্রদক্ষিণ করে। প্রতিটি ল্যান্ডস্যাট্ 570 মাইল (918 কি. মি.) উচ্চতায় ওড়ে। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচে পৃথিবীর ছবি তুলতে থাকে। শুধু পৃথিবীর যে দিকটায় সূর্যের আলো থাকে সে দিকের ছবি। একটা বলকে ফিতে দিয়ে মুড়লে যেমন হয়—তেমনি পর পর ছবি উঠতে থাকে। 1980 সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাটা এমন ছিল,—আজ ল্যান্ডস্যাট্—1 যে জায়গায় ছবি তুলেছে ঠিক আঠেরদিন পর ল্যান্ডস্যাট্-2 সে জায়গাতেই ছবি তুলবে। ল্যান্ডস্যাট্—3 কাজ শুরু করার পর ঐ ব্যবধানটা 9 দিনের হয়ে দাঁড়ায়। এই মহাকাশযানগুলি 80° উত্তর অক্ষাংশ থেকে 80° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অঞ্চলেরই ছবি তুলতে সক্ষম। অর্থাৎ, আণ্টারক্টিকার সামান্য অঞ্চল, গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরের কোন অংশ এবং আর্কটিক সাগরের অংশ ছাড়া সারা পৃথিবীর ছবি তুলছে তারা। প্রতি ল্যান্ডস্যাটে দুটো করে আধুনিক যন্ত্র আছে। সাধারণ ক্যামেরার মতো এগুলো ছবি তোলে না। বস্তুতঃ এরা পৃথিবীকে দেখে। পৃথিবীর বারোটি দেশে অবস্থিত বারোটি স্টেশনে এই তথ্য সরাসরি চলে আসে। স্টেশনগুলির তিনটি আমেরিকায়, দুটো কানাডায়, দুটো দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জেণ্টিনায়, দুটো ইউরোপের ইটালি ও সুইডেনে, দুটো এশিয়ার জাপান ও ভারতে এবং একটি অস্ট্রেলিয়াতে। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা হয়।

ল্যান্ডস্যাটের খবর যোগাড় করার বহর বিরাট। প্রতি সেকেণ্ডে সে পৃথিবীতে দশ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের খবর পাঠাচ্ছে। প্রতিটি ছবি 13000 বর্গমাইল অঞ্চলের খবর দিচ্ছে। খবর দিচ্ছে একই সঙ্গে ভূবিজ্ঞানীদের, বনবিভাগকে, খনিজ সংস্থাকে, ভূমিজল সংস্থাকে, ভূমি

সংরক্ষকদের, মানচিত্রকরদের, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাকারীদের এবং আরও অন্যান্যদের।

বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর অবস্থা তুলনা করার জন্য ল্যান্ডস্যাট্‌কে ব্যবহার করা হয়। যেমন, আজকের সাথে এক মাস আগের, এক বছর আগের বা পাঁচ বছর আগের। একই সঙ্গে বিশাল অঞ্চলের ছবি পাওয়ার ফলে মাইলের পর মাইল জুড়ে পৃথিবীর বুকে যেসব বিশেষ লক্ষণ রয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করা যায়। ছবির স্পষ্টতার দরুন এবং বিভিন্ন জিনিসকে ছবিতে বিভিন্ন রঙে দেখা যাওয়ার ফলে এক একর মাপের জমিও পরীক্ষা করা সম্ভব। জলাশয় বাড়া বা কমা, বরফের বিস্তৃতি, মরুভূমির ব্যাপ্তি, জঙ্গলে জল জমা, ইত্যাদির পরীক্ষাও খুব সুন্দরভাবে করা যায়। ল্যান্ডস্যাটের ছবিগুলিতে ইনফ্রা-রেড রঙ্ (যা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না) ব্যবহার করার ফলে, ঐ সব ছবি থেকে ফসলের স্বাস্থ্য লক্ষ্য করা যায়,—তারা কিভাবে খরা ও বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ছে, তাও। ভূপৃষ্ঠের পাথরের ছবি থেকে তার সমীক্ষা ও খনিজপদার্থের উদ্ধার-কার্যের ব্যাপারে মত দেওয়া সম্ভব। ছবিকে বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এও বলা যায় যে প্রতি একরে মোট কত পরিমাণ গাছপালা ও অন্যান্য 'প্রাণ' রয়েছে। ল্যান্ড-স্যাটের ছবি থেকে ঋতুর পরিবর্তন বোঝা যায়, ফসলের উৎপাদন ও বৃদ্ধির কাজে নামা যায়; হিমবাহের নকসা তৈরি করা যায়। ল্যাবরেটরীতে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলের তথ্য জানা সম্ভব। দুর্গম মরুপ্রান্তরে কোথায় জলের জন্য কূপ খনন করতে হবে সেটাও ঠিক করা সম্ভব। প্রতি বছর নদীতে বন্যার ফলে জীবন ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। ল্যান্ডস্যাটের ছবি থেকে বোঝা যায়, কিভাবে পাহাড়ের উপরের বরফ গলে নদীর জল ধীরে ধীরে উপত্যকা পার হয়ে প্রচুর গলন সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ে। সমুদ্র তীরে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ শহরের আশেপাশে সমুদ্র দূষণের চিহ্ন এই ছবিতে ধরা পড়ে। ছবিতে অনুন্নত অঞ্চল এবং উন্নত অঞ্চলের তফাৎও খুব ভালভাবে বোঝা যায়।

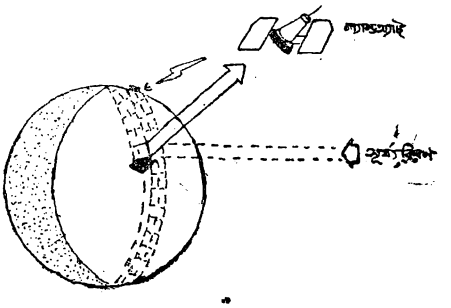

বিজ্ঞানের, বিশেষ করে মহাকাশ এবং কম্প্যুটার বিজ্ঞানের যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে 1990 সালের মধ্যেই মানুষ মহাকাশে এমন সব যন্ত্রপাতি পাঠাতে সক্ষম হবে, যা থেকে পাঠানো ছবির স্পষ্টতা হবে দশ গজ দূরের জিনিস দেখার মত। 2000 সাল নাগাদ মহাকাশে রাখা 'চোখ' এর সাহায্যে মানুষ এমন সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে, যা মানুষের চোখ দেখতে অক্ষম। এই তথ্য মহাকাশ থেকে সরাসরি পৃথিবীর মাটিতে রাখা কম্প্যুটারে চলে আসবে এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তা থেকে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও সাবধান বাণী বেরিয়ে আসবে।

আমাদের পৃথিবীকে আমরা আরও ভালভাবে দেখবো জানবো।

সায়েন্স অ্যাপটিটিউড্ এণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট ঃ 1986

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন—পঃ বঃ, 98 বেলতলা রোড, কলি-19

পরীক্ষার দিন ঃ 28শে সেপ্টেম্বর, 1986

চতুর্থ শ্রেণী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে পরীক্ষা হবে। গাণিতিক ও বিজ্ঞানমূলক বিচার ও সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ভাবনার উন্মেষ ঘটানোই এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শীর্ষ স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। অন্যান্য খবরেরজন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন ঃ

সত্যেন্দ্রনাথ গিরি, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, 25/3 খালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-19

অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের জন্য এসোসিয়েশন অফিস ও পরীক্ষাকেন্দ্রের আহ্বায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9 তেও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া যাবে।

ভালবাসার উপহার যা শুধু বাড়ে আর বাড়ে

চিলড্রেনস গিফট গ্রোথ ফাণ্ড ১৯৮৬

একটি বিনিয়োগ

৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেন্ডের সাথে যা ১২ গুণ অব্দি বাড়ে

ঠিক এর জন্যই আপনি অপেক্ষা করছিলেন। চিলড্রেনস গিফট গ্রোথ ফাণ্ড ১৯৮৬ এমনিই এক প্রকল্প যা প্রিয় শিশুটির প্রতি আপনার যত্ন ও ভালবাসাকেই প্রকাশ করে তোলে।

এই প্রকল্পে আছে বছরে ১২.৫% হারে সুনিশ্চিত ডিভিডেন্ড যা আপনা থেকেই মূল বিনিয়োগের সাথে যোগ হয়। এবং প্রত্যেক ৫ বছরে আছে বিশেষ বোনাস ডিভিডেন্ড। এ সবের অর্থ হল' আপনার উপহারটি ৬ বছরে দ্বিগুন আর ২১ বছরে ১২ গুন হয়ে যায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট:

যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক, পিতামাতা, স্বজন বা শুভাকাঙ্খী, ১৫ বছরের নীচে যে কোন শিশুকেই এই উপহার দিতে পারেন। বয়স যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই।

এই উপহার শিশুটির ২১ বছর বয়সে পূর্ণতা লাভ করে। ১৮ বছর বয়সেও ভাঙিয়ে নেওয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার আগে মূল বিনিয়োগ বা ডিভিডেন্ড কোনটাতেই কেউ হাত দিতে পারবেন না।

ন্যূনতম ৫০ টি ইউনিট বা তার গুণিতকে যে কোন সংখ্যক ইউনিটের জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। কোন উর্দ্ধসীমা নেই।

১৯৮৬-র ফিনান্স অ্যাকটে উপহার কর ছাড়ের সীমা ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

আঞ্চলিক কার্যালয়
২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোনঃ ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮

শাখা কার্যালয়
আশা নিবাস ২৪৫ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪
ফোনঃ ৫৬১৪১
পি. ডি. চালিহা রোড, শিলপুকুরি, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৩
ফোনঃ ২৩১৩১
জীবন দীপ বিল্ডিং, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১
ফোনঃ ২২৪৭০

Sista's-UTI-056 BEN

কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা—1986

আগামী 2রা অক্টোবর 1986 বৃহস্পতিবার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, খড়্গপুর-এর সহযোগিতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ দুপুর 1টা থেকে কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষার আয়োজন করেছে। কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ বিভিন্ন জেলাতে অনুরূপ পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পরীক্ষা কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলার নবম/দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতি স্কুল থেকে সর্বাধিক দুজন ছাত্র ও দুজন ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রশ্নপত্র রচিত হবে বাংলায়। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিখতে হবে। প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ আবেদন পত্র পূরণ করে মূল দপ্তরে পাঠাতে হবে 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে। পরীক্ষার জন্য কোন ফি দিতে হবে না। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নিজ ব্যয়ে হাজির থাকতে হবে। পরীক্ষার সময় 45 মিনিট। প্রধানতঃ জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের উপরে 'ক্যুইজ' টাইপের প্রশ্ন থাকবে। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের তরফে একজন শিক্ষক অথবা শিক্ষিকাও উপস্থিত থাকতে পারেন। এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতামালারও আয়োজন করা হতে পারে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আশা করা যায়। মেদিনীপুর জেলার ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের নিজেদের তৈরি মডেল এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করতে পারেন। অনুষ্ঠান শেষে সফল তিনজন প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেটসহ মোট 200 টাকার গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রতিযোগীদের বিচারকদের অভিমত অনুযায়ী সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে। ইচ্ছুক প্রতিযোগিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানাতেও যোগাযোগ করতে পার।

অমরনাথ রায়	আশিস মান্না	সুধাংশু পাত্র
এন/বিটি 99A	মেছেদা বাজার	পোঃ কালিন্দী
নিউ ট্রাফিক,	মান্না এণ্টারপ্রাইজ	মেদিনীপুর
পোঃ ইন্দা,	পোঃ মেচেদা	
মেদিনীপুর	মেদিনীপুর	

এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। নিচের আবেদন পত্রের নমুনা অনুযায়ী আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।

আবেদন পত্র

কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা 1986

আমি… … … … … … … বিদ্যালয়ের ছাত্র। শ্রেণী… … … …। বয়স… … … …। কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর ও সীল। ……

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ……

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখতে হবে।

আবেদন পত্র পাঠাতে হবে

সম্পাদক ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সৌজন্যে প্রচারিত

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বাণীরূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

পরের দিন শনিবার, গোয়ালা এলো নিশ্চিন্তে।
কী হে, ওদিককার খবর কিছু শুনেছো?
ওহ, দারুণ! আমাদের সেনাবাহিনী ওদের চার পাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। আরও ভারী ভারী সব কামান আসছে।
টিলার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু রেলপুলের কাছেই...
অসম্ভব, আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না। টিলাটা এখন বিপজ্জনক
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চোঙটা থেকে ধোঁয়া উঠছে।
বেচারা মঙ্গলবাসী! আমাদের এত সৈন্য সামন্ত আর বড় বড় কামানের সামনে দুটো চোঙ, আর শুঁড়ওয়ালা কয়েকটা জীব। ওরা কতোক্ষণ পারবে?
বুম-বুউম...
বেলা তখন তিনটে।
আমাদের সেনাদল দ্বিতীয় মহাকাশ-যানটির উপর কামান দাগছে। এতোক্ষণে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল মনে হয়।
সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা। প্রথম মহাকাশযানটির উপরও কামান দাগা শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ...
ফায়ার!
বুম!
10

উঃ, কী ভয়ঙ্কর গর্জন! চায়ের পেয়ালা-গুলো পর্যন্ত ঝন ঝন করে উঠলো।
--গুউউউম--
ওহ, একটা সবুজ রশ্মি জ্বলন্ত মৃত্যুর মতো নাচতে নাচতে যাচ্ছে। গাছগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে।
একি! ও কীসের শব্দ! ঐ আসো---
--জা-জা-জা-জা---
---গুম--গুউউম---
আহ, কলেজের ছাদ, গির্জার চূড়া- সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে।
আর এক দণ্ডও এখানে নয়, চলো, পালাতে হবে, এক্ষুনি।
পালাবো, কিন্তু কোথায়?
ট্রেনে যাওয়া যাবে না, চলো, মামার বাড়ীতেই যাই। কম পক্ষে বারো-চৌদ্দ মাইল দূর। আশা করি সেখানে এক বার পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ।
11

পথে একদল ঘোড়-সওয়ারের সাথে দেখা···
পালাও, পালাও সব। সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। আমাদের কামান ওদের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি।
তাড়াতাড়ি একটা গাড়ীভাড়া করে আমরা ছুটলাম।
গৌতম কর্মকার
পথে পড়লো একদল সৈন্য···
একি! হাঁফাচ্ছো কেন তোমরা? কী হয়েছে?
চোঙ থেকে ওরা বেরুচ্ছে। কালো কালো কুৎসিত, কী ভয়ঙ্কর দেখতে!
-সপাং-সপাং-
নাহ, আর একটুও কোথাও দেরী নয়। এই বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে পালাতেই হবে।
··বুম··বুউম··
উঃ, এখনও কামানের গর্জন!
12

[22 পৃষ্ঠার পর]

দেখাতে পারে সেটাই যেন ও মেনে নিতে পারছিল না। আবার অন্যদিকে তাকাল জন কিংম্যান।

হাসপাতালের সেই কেরানী এবার এসে দাঁড়াল।

'ডাঃ ব্র্যাডেন···ইয়ে···আমার মনে হয় কোথাও কোন ভুল হয়েছে। মারাত্মক রকম ভুল!' সে বলল।

'কি ভুল?' ব্র্যাডেন বললেন।

'কিংম্যানের ভর্তি হওয়ার কোন তারিখ লেখা নেই। প্রত্যেক বছরেই আলাদা আলাদা তালিকা থাকে। তাই কয়েক বছরের তালিকাই দেখেছি। গত বিশ বছরের তালিকা দেখলাম—আর প্রতি বছরই জন কিংম্যানের নাম আছে।'

'তাহলে ত্রিশ বছরের দেখ।'

'আ···আমি তাও দেখেছি', কেরানীটি জানাল। 'ত্রিশ বছর আগেও সে রোগী হিসেবে ছিল।'

'তাহলে চল্লিশ?' ব্র্যাডেন বললেন।

ঢোঁক গিলল কেরানীটি। 'ডাঃ ব্র্যাডেন। আমি··· আমি বাতিল করা ফাইলও দেখেছি। 1850 সালে কিংম্যানের নাম ছিল!'

ডাঃ ব্রাডেন এবার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'যত বাজে কথা। সে তো আটানব্বই বছর আগের কথা।'

ভেঙে পড়ল কেরানীটি। 'জানি, ডাঃ ব্র্যাডেন। কোথাও কোন মারাত্মক ভুল হয়েছে। আমি গত বিশ বছর চাকরি করছি, রেকর্ডে কখনও ভুল করিনি।'

'তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি নিজেই দেখব,' ডাঃ ব্র্যাডেন বললেন। 'কাউকে এখানে জনের জন্য পাঠাও।'

ডাঃ ব্র্যাডেনের চোখ পড়ল এবার জন কিংম্যানের উপর। সব ব্যাপার দেখে সে যেন মজা উপভোগ করছিল।

'এটা অসম্ভব কথা!' ডাঃ ব্র্যাডেন বলে উঠলেন। 'তুমি এখানে কখনই আটানব্বই বছর ধরে থাকতে পার না।'

ডাঃ ব্র্যাডেন কথা বলার ফাঁকে জন কিংম্যানের ডান হাতের ছটা আঙুল যেন কিছু কাঁটতে চাইছিল। ডাঃ ব্রাডেন ওর হাতে একটা পেন্সিল ধরিয়ে দিলেন। তারপর পকেট হাতড়ে এক খণ্ড কাগজও দিলেন।

জন কিংম্যান অবহেলার সঙ্গেই দূরে দৃষ্টি মেলে ধরল অথচ ওর হাত কাগজের উপর পেন্সিলে অদ্ভুত কিছু আঁকতে চাইছিল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডই ওর লাগল। এরপর সে কাগজটা ব্র্যাডেনের হাতে দিল। জন কিংম্যানের মুখে এবার যেন বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল।

ব্র্যাডেন কাগজটার দিকে তাকাতেই দেখলেন একটা নকশাই ফুটে উঠেছে। কতগুলো সরল রেখা আবার তারই মাঝখানে একটা নকশা। এটা কোন উন্মাদের আঁকা নয়। পাগলামির মধ্যে কখনও শিশুসুলভ ভাব থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা নেই। ছবিটা যেন পদার্থ বিদ্যার কোন কিছু।

'এটা আমার এলাকায় পড়ে না, জন,' ডাঃ ব্র্যাডেন বলে উঠলেন। 'তবে এটা পরীক্ষা করাব। মনে হচ্ছে তোমার জন্য কিছু করতে পারব।'

একজন এসে জন কিংম্যানকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেতে গেলে সে হাত সরিয়ে সোজা রাজকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল। যেন কারও স্পর্শে ওর দেহে ময়লা লেগে যাবে।

ডাঃ ব্র্যাডেন রেকর্ড ঘরে এসে পুরনো রেকর্ড ঘাঁটতে শুরু করলেন। বহু পুরনো কাগজও তিনি দেখলেন। এত পুরনো যে ওগুলো জীর্ণ, হলদে হয়ে গেছিল। 1880, 1850, 1853—সব বছরেই উল্লেখ ছিল জন

আমি এবার জন কিংম্যানকে ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে চাই।

কিং-ম্যানের। এক জায়গায় লেখা···'দারুণ জ্বর'। 'লোকটার দুহাতেই ছটি করে আঙুল'। সেটা পঁচানব্বই বছর আগেকার কথা।

ডাঃ ব্র্যাডেন পাশেই দাঁড়ানো উত্তেজিত কেরানীর দিকে তাকালেন।

'কেউ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা লিখে রাখতে ভুলে গেছে', ব্র্যাডেন বললেন। 'আমার ধারণা জন কিংম্যান যথাসময়েই মারা যায়, আর তারপর অন্য কোন অজ্ঞাত পরিচয় রোগী ভর্তি হলে ওই নামই তাকে দেওয়া হয়।'

কেরানীটি প্রায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু ডাঃ ব্র্যাডেন কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। একই নামের রোগী হলেও দুজনেরই দুহাতে ছটা করে আঙুল থাকা সম্ভব নয় কখনই। অন্ততঃ একই শতাব্দীতে।

ডাঃ ব্র্যাডেন এবার যাদুঘরে হাজির হলেন। সেখানে হাসপাতালের প্রাচীন নথিপত্র রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় 1776 সালে। চামড়ায় বাঁধানো নথিগুলো দেখতে লাগলেন ব্র্যাডেন।

আচমকা 1786 সালের রেকর্ডটার উপর তার চোখ পড়ল। সেখানেও তিনি জন কিংম্যানের নাম পেলেন। 1786 সালের 21 মে হাসপাতালে জন কিংম্যান নামে এক রোগী ভর্তি হয়। ওতে লেখা ছিল : 'এক দরিদ্র উন্মাদকে আজ ভর্তি করা হয়। ওর রাজকীয় হাবভাবের জন্য নাম দেওয়া হল জন কিংম্যান। রোগীর দু'হাতেই ছটি করে কার্যকর আঙুল। ডাঃ স্যানফোর্ড দেখেছেন ওর প্রচণ্ড জ্বর। রোগীর কাঁধে বিচিত্র একটা নকশা আঁকা। ওর হাবেভাবে মনে হয় সে মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য করা গেছে যে সবসময় আঁকি বুঁকি কাটতে চায়।'

ডাঃ ব্র্যাডেন রিপোর্টটা একবার পড়ার পর আবার পড়লেন। তারপর তৃতীয় বার। এরপর কেরানীটি এসে যখন জানাল এই হাসপাতালের ইতিহাসে জন কিংম্যান নামে কোন রোগী মারা যায়নি—ডাঃ ব্র্যাডেন অবাক হলেন না।

'ঠিক কথাই', ব্র্যাডেন প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কেরানীকে উত্তর দিলেন। 'সে মারা যায়নি। আমি এবার জন কিংম্যানকে ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে চাই। তাকে এতকাল অবহেলা করা হয়েছে, আমি তার ভালমত চিকিৎসা করতে চাই। সে ভর্তি হয় 1786 সালের 21মে।'

বেচারি ভেঙেপড়া কেরানীকে রেখে চলে গেলেন ডাঃ ব্র্যাডেন। কেরানীর কোন সন্দেহই ছিল না ডাঃ ব্র্যাডেন নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছেন। ওয়ার্ডে জন কিংম্যানকে নয় ডাঃ ব্র্যাডেনকেই রাখা হবে এবার।

জন কিংম্যানকে হাসপাতালের গবেষণাগারে নিয়ে আসা হলে সে বেশ মজা পাচ্ছিল। প্রায় দশ সেকেণ্ড ধরে ডাঃ ব্র্যাডেন তাকে লক্ষ্য করে গেলেন। তারপর তাকালেন ঘরের অতি আধুনিক সব যন্ত্রপাতির দিকে। কিংম্যান বিরাট এক্স-রে মেশিনটা দেখে প্রায় হাসতে চাইছিল।

'ওর মধ্যে কোন রকম উন্মত্ততার লক্ষণই নেই', ডাঃ ব্র্যাডেন এক্স-রে টেকনিশিয়ানকে বললেন। 'তারা সব সময় ভাবে তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হবে।'

জন কিংম্যান এবার ডাঃ ব্র্যাডেনের দিকে তাকিয়ে আঙুল নেড়ে কিছু লেখার ইঙ্গিত করল। ব্র্যাডেন ওর হাতে একটা পেন্সিল আর কাগজ তুলে দিলেন। জন কিংম্যান দ্রুত, অবহেলার সঙ্গে কিছু এঁকে সেটা এগিয়ে ধরল। ওর মুখে মানুষের প্রতি যেন অনুকম্পার হাসি।

'এটা তো মনে হচ্ছে কোন এক্স-রে টিউবের ছবি, তাই না?' ডাঃ ব্র্যাডেন টেকনিশিয়ানকে বললেন।

চোখ বড় বড় করে তাকাল সে।

'ঠিক ঠিক প্রতীক ব্যবহার হয়নি বটে', লোকটা বলল। তবে—ও—হ্যাঁ। এটা তো দেখছি ক্যাথোড—হুম্। হ্যাঁ—তাইতো—।'

টেকনিশিয়ান আরও গভীরভাবে ছবিটা দেখে চলল।

সে এবার বলল, 'ও তো ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ একেঁছে।' উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ল ও। 'আশ্চর্য ব্যাপার—এরকম হলে এক্স-রে আলোকে বেশ সরু করে ফেলা যাবে—।'

ডাঃ ব্র্যাডেন বললেন, 'তাই ভাবছি। এটা কি অন্য কোন ধরনের এক্স-রে?'

'ডাঃ ব্র্যাডেন', উত্তেজিত ভাবে বলল টেকনিশিয়ান, 'কাগজটা আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে দেবেন? এটা দারুণ আবিষ্কার হতে পারে। হয়তো এরকম যন্ত্র বানাতে পারলে ব্যাটারীতে চালানো যাবে আর ডাক্তাররাও বয়ে নিতে পারবেন।'

ডাঃ ব্র্যাডেন কাগজটা নিয়ে পকেটে রেখে বললেন, 'জন কিংম্যান এখানে একশ বাষট্টি বছর ধরে রোগী হিসেবে রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের জন্য আরও আশ্চর্য কিছু অপেক্ষা করছে। এখন হাতের কাজ শেষ করা যাক।'

জন কিংম্যান সত্যিই মজা পাচ্ছিল। কিছু বাচাল আর মূর্খই তাকে বিরক্ত করছে এমন একটা ভাবই সে দেখাতে চাইছিল। বাচ্চারা যেভাবে খেলতে চায় সেই ভাবেই সে ওর এক্স-রে তুলতে দিল। বগলের নিচে

থার্মোমিটার রাখতেও দিল সে, নিজের কাঁধের নকশাও দেখাতে আপত্তি করল না। কোন রকম বিরক্তিই সে প্রকাশ করল না, সবটাই যেন কোন মজা এমনই ভাব দেখাতে চাইল জন কিংম্যান।

ডাঃ ব্র্যাডেন পরীক্ষা চালাতে গিয়ে নিজেই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। জন কিংম্যানের দেহের তাপ 105° ডিগ্রী ফারেনহাইট। দারুণ জ্বর—সেই 1850 সালে যেমন দেখা যায়—প্রায় আটানব্বই বছর আগে। 1786 সালেও তাই ছিল। অথচ দেড়শ বছরের মত বয়স হলেও কিংম্যানকে দেখাচ্ছে যেন চল্লিশ কি পঞ্চাশই হবে ওর বয়স। ওর নাড়ীর গতি মিনিটে একশ সাতান্ন। ই. সি. জি. তে ওর হার্টের গতির যে দৃশ্য ফুটে উঠেছিল তা অবিশ্বাস্য। ব্র্যাডেন আপন মনেই বলে উঠলেন, 'ওর দুটো হৃৎপিণ্ড থাকলেও অবাক হব না।'

এরপর সবচেয়ে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা দেখা গেল। মেশিন থেকে এক্স-রে প্লেট বের করার পর দেখা গেল জন কিংম্যানের দুটো হৃৎপিণ্ড রয়েছে। তাছাড়া দুপাশে পাঁজরার সংখ্যাও তিনটে করে বেশি। তাছাড়াও ওর কনুইর সন্ধিতেও অদ্ভুত কিছু ছিল। দাঁতও আশ্চর্য রকম।

পরীক্ষা শেষ হলে জন কিংম্যান সেই অনুকম্পার দৃষ্টিতেই তাকালো। পোশাক পরা হলে সে হাসিমুখে ব্র্যাডেনকে লক্ষ্য করেই লেখার ভঙ্গি করল। ডাঃ ব্র্যাডেন আবার এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল এগিয়ে ধরলেন।

জন কিংম্যান আবার দ্রুত হাতে কাগজে কিছু নকশা এঁকে ব্র্যাডেনের দিকে এগিয়ে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবার ডাঃ ব্র্যাডেন। আগের ছবির চেয়ে এটা আলাদা ঠিকই, তবে আরও উন্নত ধরনের কোন যন্ত্রেরই নকশা! আগে একটু ধাঁধায় পড়ে থাকলেও আর কোন সন্দেহই তার রইল না, এ যন্ত্রটা পরমাণু বিভাজনের। এটা তারই নিখুঁত কোন নকশা। নকশা থেকেই বোঝা যায় কিভাবে সাধারণ স্থায়ী পরমাণু অস্থায়ী পরমাণুতে পৌঁছয়। অল্প কথায় এ হল এক প্রক্রিয়া যা থেকে পরমাণু শক্তির জন্ম। ব্র্যাডেন জন কিংম্যানের বিরক্ত অথচ খুশি খুশি চোখের দিকে তাকালেন।

'মনে হচ্ছে তোমারই জিৎ', কাঁপা গলায় বললেন তিনি। 'আমার এখনও মনে হচ্ছে তুমি উন্মাদ, তবে আমরা হয়তো আরও বেশি উন্মাদ।'

জন কিংম্যান সম্পর্কিত কাগজপত্রের বয়স একশ বাষট্টি বছর। ওগুলো ঝরঝরে পুরনো হয়ে গেছে। সে প্রথম ভর্তি হয় 1786 সালের 10 এপ্রিল। যে ওকে নিয়ে আসে তার নাম টমাস হক্স পেনসিলভানিয়ার একটা রাস্তা থেকে। কিংম্যানের দেহে অদ্ভুত পোশাক ছিল। হক্স অবাক হয়ে ভেবেছিল কোনও ধাতুতে বানানো অথচ যেন রেশমী কাপড়। হকস্ তাকে রাস্তায় বসে থাকতে দেখে ওর ঘোড়ায় তুলে নেয়। অনেক প্রশ্ন করলেও কিংম্যান কোন জবাব দেয়নি। সে রাস্তায় অদ্ভুত আঁকি বুঁকি কেটে চলেছিল এরপর শহরে এসে। ওর চারদিকে লোকও জমা হয়। সে ওই নকশা দেখিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছিল। লোকেরা না বুঝতে পারায় ও তাদের লক্ষ্য করে থু থু দিতে থাকে। এরপর পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ ব্র্যাডেন মেডভিল মানসিক হাসপাতালের ডাইরেক্টর আর ওয়াশিংটনের একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তাদের সব রেকর্ড পড়া হয়ে গেলে ব্র্যাডেন ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

'লোকটা নিঃসন্দেহে অপ্রকৃতিস্থ। সে নিজেকে উঁচু স্তরের বলেই ভাবে। যেন নেপোলিয়ান বা এডিসন। আর জন কিংম্যানের এমন ভাবনার কারণও আছে। অথচ তাকে পাগল বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই। সে শুধু শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই এ রকম করে চলেছে।'

ডাইরেক্টর যেন কিছুটা ধাক্কা খেয়েই বললেন, 'ডাঃ ব্র্যাডেন! আপনি এমন ভাবে বলছেন যেন ও মানুষ নয়!'

'নয়ই তো', ডাঃ ব্র্যাডেন বললেন। 'ওর শরীরের তাপ 105° ডিগ্রী। ওর বাড়তি হাড় আছে—আছে দুটো হৃৎপিণ্ড। ওর শরীরের সব পরীক্ষা করেছি, সেগুলো মানুষের মত নয়। আর—আর সে গত একশ বাষট্টি বছর ধরে রয়েছে। সে মানুষ হলে সত্যিই অভিনব।'

অপরজন বললেন, 'ও কোথা থেকে তাহলে এসেছে, ডাঃ ব্র্যাডেন?'

ডাঃ ব্রাডেন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কোন আন্দাজ করব না। তবে ও যে নকশা একেঁছে সেগুলো ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডে পাঠিয়েছি। জানতে চেয়েছি এগুলো পদার্থ বিদ্যার কিছু কিনা। আমি মনে করি ওর সে জ্ঞান আছে।'

'হ্যাঁ আছে', ওয়াশিংটনের লোকটি বললেন। 'ও যা একেঁছে তাহল সিলিকন—অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ লভ্য বস্তু থেকে পরমাণু শক্তি বের করার কৌশল।'

ডাঃ ব্র্যাডেন দৃঢ়স্বরে বললেন, 'কাগজে উল্কাপাতের কথা লেখা আছে পড়েছেন? আমি তখনকার কাগজ পড়েছি।'

হয় 'ব্ল্যাকহোল্' বা কৃষ্ণ গহ্বর। এই ব্লাকহোলই সেই 'কালো বামন'।

1953 সালে আমেরিকার জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ফাউলার তাঁর তত্ত্বে বলেন, নক্ষত্রের মধ্যে 10^7 ডিগ্রী কেলভিন উত্তাপে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় ও চাপ বাড়ে। হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হলে 10^8 ডিগ্রী কেলভিন উত্তাপে হিলিয়াম পারমাণবিক জ্বালানি হিসাবে কাজ করে, তৈরি হয় কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। তাপমাত্রা আরও বাড়ে। তখন একই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন, কার্বন থেকে তৈরি হয় নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, লোহা, সীসা, বিসমাথ প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থ। কখনও কখনও সংশ্লেষণের ফলে ভর কমতে কমতে নক্ষত্রটি এত ছোট হয়ে পড়ে, যার ফলে তার বাইরের ইলেকট্রন কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেয় নিউট্রন। এইভাবে নক্ষত্রটি 'নিউট্রন ষ্টারে' পরিণত হয়। আবার মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ চলার সময়ে কখনও কখনও নক্ষত্র তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। তখন হয় 'নোভা' বা 'সুপারনোভা' এক্সপ্লোশান অর্থাৎ নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ। এর ফলে নক্ষত্রের মধ্যেকার ঐ সব মৌল অণু মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর বিকীর্ণ হতে থাকা প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি এবং মহাজাগতিক রশ্মি।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি ● নিয়মাবলী

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু এজেন্টদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

প্রচার দপ্তর ঃ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান
86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

রেগুলেটার

অভিজিৎ মিত্র

পাখার রেগুলেটার কি করে কাজ করে জানা যাক ঃ

তোমরা জান বাইরের তড়িৎ—উৎসের দুই প্রান্তের সঙ্গে মোটরের আর্মেচারে যোগ হয়। আর নেগেটিভ তারের মধ্যেই রেগুলেটারটা জুড়ে দেওয়া হয়। রেগুলেটারের হাতলটি ঘুরিয়ে 1 থেকে 5 প্রভৃতি ঘরে নিয়ে গেলে, মোটরের তড়িৎপ্রবাহ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে, কিন্তু off স্থানে নিয়ে গেলে তড়িৎপ্রবাহ ছেদ ঘটে আর পাখা বন্ধ হয়।

যাক এবার ছবিটা দেখা যাক, ছবির উপরের দিকে কার্টিমের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চারটি খণ্ডে তড়িৎরোধক তার দিয়ে জড়ানো থাকে। প্রথমে SR_1S_2, দ্বিতীয় খণ্ড $S_2R_2S_3$। এইভাবে S_5 পর্যন্ত ভাগ করা আছে। এখন বাইরের হাতলটার সঙ্গে যে ধাতব অংশের যোগ, তারই এক অংশ হলো P। হাতল ঘোরালে P, S_1—S_5 পর্যন্ত স্থানে জড়ানো তারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। রেগুলেটারে বিদ্যুৎ পজিটিভ 'A' প্রান্ত দিয়ে 'C' তে পেঁছায়, আর 'C' থেকে S_5-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। 'P' অংশটি হাতলের মধ্যে দিয়ে 'D' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেগেটিভ প্রান্ত 'B' এর সহিত সংযোগ স্থাপন করে। তাহলে দেখ 'A' প্রান্ত হলো পজেটিভ আর 'B' হলো নেগেটিভ প্রান্ত। হাতল যখন off স্থানে থাকে তখন তড়িৎপ্রবাহ 'A' থেকে 'B' প্রান্তে যেতে পারে না। যার ফলে পাখাও চলে না। এবার হাতল ঘুরিয়ে 'S_1' স্থানে আনলে তড়িৎপ্রবাহ 'C' থেকে $S_5(R_4+R_3+R_2+R_1)S_1$ পথে নেগেটিভ প্রান্তে যাবে এবং তারের রোধের জন্য তড়িৎপ্রবাহ কমে যাবে। যার ফলে ঘূর্ণনের দ্রুতি কম হবে। এইরূপ হাতল ঘুরিয়ে 'S_2' আনলে তড়িৎ 'C' প্রান্ত থেকে $S_5(R_4+R_3+R_2)S_2$ পথে নেগেটিভ (D) প্রান্তে যাবে। প্রথম থেকে রোধ কম হবে, পাখাও একটু জোরে ঘুরবে। এইরূপ হাতলটা ঘুরিয়ে 1, 2, 3, 4, প্রভৃতি স্থানে নিলে এক একটি প্যাঁচানো তার খণ্ড কমে যাবে এবং তারের রোধও কম হবে, যার সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও পর পর বেড়ে যাবে। হাতলটা 'S_5' এর স্থানে এলে প্রবাহ 'C' হতে 'S_6' স্থান দিয়ে কোন রোধ অতিক্রম না করে নেগেটিভ প্রান্তে চলে যাবে, ফলে তড়িৎ সবচেয়ে বেশি হবে। পাখাও ঘুরবে সবচেয়ে জোরে তখন।

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট পার্থসারথি চক্রবর্তী

দরজার ত্রি-টোন টুংটাং বেল

তোমার বাড়িতে একটা সুন্দর ত্রি-টোন বেল লাগাতে চাও যা টুংটাং করে বাজবে ?

নিচের সার্কিট ডায়াগ্রামের পুরো ছবি দেখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এটা একটা ট্রানজিস্টারাইজড অডিও অসিলেটর-এর পরিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুশ্-বাটন্-এ (অর্থাৎ ইলেকট্রিক কনট্যাক্ট) যখন চাপ দেওয়া হয় তখন অডিও অসিলেটর সার্কিটের বিভিন্ন রেজিস্টরকে সংযুক্ত করে, ফলে অসিলেসনের ফ্রিকোয়েন্সিটা বদলে যায়। রেজিস্টরের রোধ যত বেশি হবে—ফ্রিকোয়েন্সি তত কমবে। সার্কিটের চেহারা তিনটে আলাদা টোনে কেমন দাঁড়াবে সেটা এঁকে বুঝানো হয়েছে।

সাধারণত এই নক্সা সর্বদা সাপ্লাইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। পুশ-বাটন্ চাপ না দেওয়া অবস্থায় যাতে কারেন্ট লিক্ না করে এবং অপ্রয়োজনীয় অসিলেসন এড়াতে চাইলে এ্যাডজাস্ট করা যায় এমন বিপরীতমুখী ভোল্টেজ-এর (adjustable reverse voltage) ব্যবস্থা থাকা চাই। 2·2k রেজিস্টরের মাধ্যমে এই বিপরীতমুখী ভোল্টেজ ট্রানজিসটরের base-এ প্রয়োগ করা হয়।

পোটেনসিওমিটারের সব চাইতে minimum position-এ base থেকে কোনও বিপরীতমুখী ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে না। আবার পোটেনসিওমিটার যখন maximum position-এ থাকবে তখন খুব বেশি বিপরীতমুখী ভোল্টেজ অসিলেসন ঘটতে দেবে না—একটা পুশ-বাটনে চাপ দিয়ে রাখলেও। পোটেনসিওমিটারের যথাযোগ্য স্থান কোথায় হবে সেটা তোমাদের সার্কিটটা লাগাবার সময় কায়দা করে বুঝে নিতে হবে।

লাউডস্পীকার বাক্সটার মধ্যে সার্কিটগুলো জড়ো করা হয়েছে সেটা কোনও central position-এ রাখতে পার। বিভিন্ন পুশ্-বাটন্গুলির আলাদা আলাদা জায়গায় পয়েন্ট করতে হবে—প্রথমটা সদর দরজা, দ্বিতীয়টা পিছনের দরজা এবং তৃতীয়টা side-এর প্রবেশ পথে। প্রত্যেকটা সুইচ যখন press করা হবে তখন বিভিন্ন টোন শুনতে পাওয়া যাবে।

কি কি জিনিস চাই

ট্রানজিসটর ঃ AC 128, একটা রেকটিফ্যায়ার ঃ BY 126 অথবা BY 127 অথবা SR 100 দুটো ; ক্যাপাসিটর ঃ ইলেকট্রোলাইটিক 100μF—25V দুটো ; পলিসটার 0·1 μF একটা ; 0·22μF একটা, পোটেন্সওমিটার ঃ 1k একটা ; রেজিসটর ; সব $\frac{1}{2}$ ওয়াট প্রত্যেকটি একটি করে 100k, 39k, 10k, 6·8k, 2·2k, 1k ; ট্রান্সফরমার ঃ output, push pull, একটা ; প্রাইমারী ম্যাচিং AC 128 এর সঙ্গে এবং সেকেণ্ডারী ম্যাচিং লাউডস্পীকারের সঙ্গে, Mains-এক,

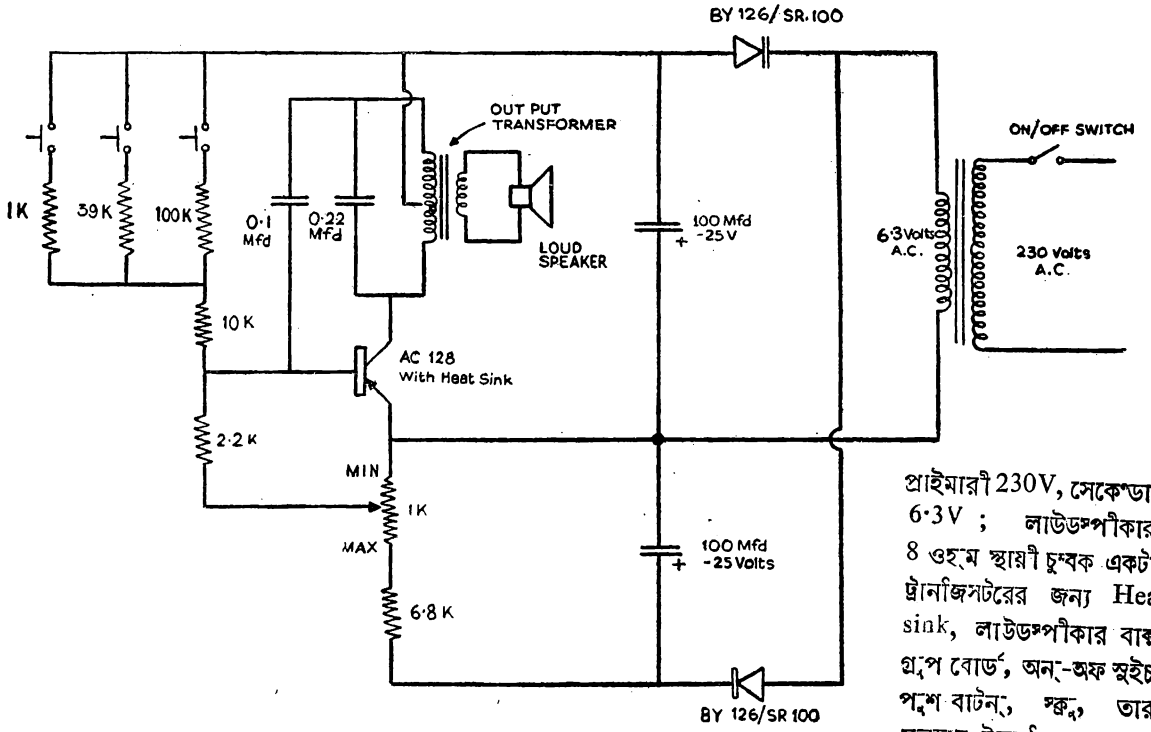

প্রাইমারী 230V, সেকেণ্ডারী 6·3V ; লাউডস্পীকার ঃ 8 ওহ্ম স্থায়ী চুম্বক একটা ; ট্রানজিসটরের জন্য Heat sink, লাউডস্পীকার বাক্স, গ্রুপ বোর্ড, অন্-অফ সুইচ, পুশ বাটন্, স্ক্রু, তার, সলডার ইত্যাদি।

সিমুলেশন খেলতে-খেলতে শেখা

~ প্রদীপ সেন ~

আমরা কেউই ভুল করতে চাই না। কোন কিছু শিখতে গিয়ে বার বার ভুল করলে মনে হয় আমি ঐ জিনিসটি শেখার অনুপযুক্ত এবং হাল ছেড়ে ঐ বিষয়ের উপর বিরক্ত হয়ে।

মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষার্থীদের এই মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শেখার ব্যাপারে একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার নাম দিয়েছেন সিমুলেশন্ (Simulation)। এটা এক ধরণের রোলপ্লেয়িং তাই একে Gaming বা খেলা আখ্যাও দিয়েছেন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষতঃ যেখানে দুর্ঘটনার ভয় থাকে সেখানে কৃত্রিম ভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা হয়। উড়োজাহাজ চালনা, চিকিৎসাবিদ্যা, বাসচালনা ইত্যাদি শিক্ষায় বিদেশে সিমুলেশেনের চাহিদা প্রচুর। এইভাবে শিক্ষা দলবদ্ধভাবে বা এককভাবে যে কোন শিক্ষার্থীকে দিয়ে যে কোন ব্যবহারিক বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করানো যায় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তৈরি করে দেওয়া হয়।

দলবদ্ধ শিক্ষার সময় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর সমান সুযোগ থাকে Gaming-এর মাধ্যমে তার পেশাগত দক্ষতা এবং নৈপুণ্য বাড়ানোর। তাছাড়া পর্যবেক্ষক হিসেবেও সে তার উন্নতি বিধান ঘটাতে পারে।

নাসার (N. A. S. A.) সিমুলেশন গেমিং-এর পাঠ তোমাদের জন্য দিচ্ছি। এটা একা একাও করতে পার অথবা ছয়জন মিলে দলবদ্ধভাবে করতে পার। এই পাঠটি বিপদের মুহূর্তে জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে এবং দলবদ্ধভাবে কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তারও পরিকল্পনা দেওয়া আছে। দলবদ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দলের প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একত হতে হবে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে। তবে সব সময় ঐকমত্য সম্ভব নয় তখন বেশির ভাগ যুক্তি যে মত মেনে নেবে সেই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠা পাবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কয়েকটি বক্তব্য খেয়াল রাখতে হবে।

(1) ব্যক্তিগত মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বৃথা তর্ক না করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করা।

(2) দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যই মত পরিবর্তন করা উচিত নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ মানসিক দ্বন্দ্ব নিঃশেষ করলে তবেই সিদ্ধান্ত নেবে।

(3) যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তগুলি যান্ত্রিকতা মুক্ত স্বাধীন চিন্তার ফসল হবে। যদি তুমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত না দিতে পার তবে অন্যান্যদের যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদগুলি মেনে নাও।

(4) যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদকেই প্রাধান্য দাও, দলের সর্বাধিক ব্যক্তিদের মতবাদকে না। এ ব্যাপারে ভোট গ্রহণযোগ্য নয়।

(5) বিভিন্ন ধরনের মতবাদ ও যুক্তি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

সিমুলেশন গেমিং-এর নির্দেশ নামা

তোমরা ছয় মহাকাশ যাত্রী। তোমাদের চাঁদের আলোকিত অংশের একটি বিশেষ অংশে মূল মহাকাশ-যানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সূচী নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তোমাদের চন্দ্রভেলা মিলন স্থান থেকে দুইশ (200) মাইল দূরে নামতে বাধ্য হয়। এই অবতরণের সময় মহাকাশযাত্রার উপযোগী বেশির ভাগ বস্তুই বিনষ্ট হয়, ফলতঃ মূল মহাকাশযানে ফিরে যাওয়ার উপর তোমাদের বেঁচে থাকে নির্ভর করছে। যে সমস্ত জিনিসগুলি নষ্ট হয়নি তাদের সঠিক ব্যবহার

এবং প্রয়োজনানুসারে গ্রহণের উপর তোমাদের মূল্যায়ন ফেরা নির্ভর করছে। দেখা গেল নিম্নোক্ত পনেরটি জিনিস অক্ষত এবং কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। তোমার কাজ হচ্ছে এই পনেরটি জিনিসকে গুরুত্ব অনুসারে সাজানো (যেগুলি নিচে এলোমেলো ভাবে দেওয়া আছে) এবং তোমার সহযাত্রীদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটিকে এক নম্বর (1), তারপরে গুরুত্ব অনুযায়ী দুই (2)·····এভাবে পনের (15) পর্যন্ত দাও। তারপর দলবদ্ধভাবে আলোচনা করে অনুরূপ ভাবে দাও। এরপর নাসার (N.A.S.A) দেওয়া র‍্যাংকিং-এর সাথে মিলিয়ে নাও।

যদি তোমার বা তোমার গ্রুপের দেওয়া র‍্যাংকিং-এর সঙ্গে নাসার র‍্যাংকিং-এর বিয়োগ ফলের যোগফল কুড়ি (20) র বেশি হয় তবে তোমার বা তোমার গ্রুপের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি।

তোমার দেয় ক্রমানুসার (A)	অক্ষত বস্তুসমূহ	দলবদ্ধভাবে দেয় ক্রমনুসার (B)
——	এক বাক্স দেশলাই	——
——	জমাট খাদ্যবস্তু	——
——	50 ফুট প্যারাস্যুট দড়ি	——
——	বহনযোগ্য তাপ উৎপাদক	——
——	দুটো ·45 যন্ত্র ক্যালিবার পিস্তল	——
——	চন্দ্র মানচিত্র (Lunanr Map)	——
——	জীবন রক্ষী বয়া (Life raft)	——
——	চুম্বক কম্পাস	——
——	দুইটি অক্সিজেন ভর্তি একশত (100) পাউন্ডের ট্যাঙ্ক	——
——	এক বাক্স গুঁড়ো দুধ	——
——	সৌর শক্তি দ্বারা চালিত F.M. গ্রাহক যন্ত্র	——
——	5 গ্যালন জল	——
——	সিগন্যাল ফ্লেয়ার্স (Signal flares)	——
——	ইনজেকশন দেওয়ার সরঞ্জাম সহ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স	——
——	প্যারাশুট সিল্ক	——

নাসার র‍্যাংকিং—পৃষ্ঠায় দেওয়া হল মিলিয়ে নাও। বিয়োগ ফল সব সময় ধনাত্মক হবে। যেমন তোমার কোন একটি বিষয়ের র‍্যাংকিং 5 এবং নাসায় 10 সেক্ষেত্রে যেমন বিয়োগ ফল 5 হবে ঠিক তেমনি তোমার র‍্যাকিং 7 এবং নাসার 2 হলেও বিয়োগ ফল পাঁচ। এরপর বিয়োগ-ফলগুলি যোগ কর।

নাসার দেয় ক্রমানুসার

(C)	C—A বা A—C	B—C অথবা C—B
15	——	——
4	——	——
6	——	——
8	——	——
13	——	——
11	——	——
12	——	——
1	——	——
39	——	——
14	——	——
2	——	——
10	——	——
7	——	——
5	——	——
	মোট	মোট

নাসা দেশলাই বাক্সকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছে এবং অক্সিজেন পাত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। কারণ চন্দ্রে এক মুহূর্ত বাঁচতে গেলেও অক্সিজেন প্রয়োজন এবং দিয়াশলাই কোন প্রয়োজনেই লাগবে না কারণ ঐ পরিবেশে ওটা জ্বলবেই না। এর থেকে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তোমরাও শিখে গেলে।

1/4 বারোয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা—10

XEROX

পার্থসারথী বড়াল

'দ্রুত ফটোকপির জন্য আসুন জেরক্স সেণ্টার।'—রাস্তা ঘাটে চলতে ফিরতে এরকম বিজ্ঞাপন আজ আমাদের হামেশাই চোখে পড়ে। বেকাররা চাকরির আবেদন পত্রে সার্টিফিকেট, মার্কশীট ইত্যাদির নকল অ্যাটাচমেণ্ট করার জন্য আজ আর গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষর পেতে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করে না। কোনো জেরক্স সেণ্টারে চলে গিয়ে স্বল্প মূল্যে, স্বল্প সময়ে পেয়ে যায় জেরক্সে ছাপা নিখুঁত প্রতিলিপি, যার সঙ্গে আসলের কোনো ফারাক থাকে না। আজকের দ্রুতগতির পৃথিবীতে সময়ের সাথে তাল রেখে চলতে হয়। ডুপ্লিকেটিংয়ের জন্য আজ আর মান্ধাতা আমলের ফটোস্ট্যাটের মন্থরতা চলে না। তাই অফিসে, কারখানায় আদালতে ইত্যাদি সর্বত্র নকল নথিপত্র রাখতে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে জেরক্স বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কপিয়ার মেশিন। এছাড়া ফটোগ্রাফিতে একবার নেগেটিভ করতে হয় বহুমূল্য প্যানক্রোমাটিক ফিল্মে এবং তার থেকেও মূল্যবান ক্লোমাইড পেপারে পজিটিভ করতে হয়। আর জেরক্সে সরাসরি সাধারণ কাগজে পাওয়া যায় পজিটিভ। তাই দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা ও স্বল্পমূল্য হওয়ায় জেরক্স আজ বহুল প্রচলিত।

কিন্তু বহুল প্রচলিত হলেও সাধারণ মানুষ জেরক্স সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই এ নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। জেরোগ্রাফি ফটোগ্রাফির মতই রিপ্রোডাকশন্ প্রসেস, যেখানে আলোক প্রতিফলন কারিগরী হিসাবে কাজ করে। ফলে একটি মাত্র আসল থেকে অসীম সংখ্যক প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ফটোগ্রাফিতে আমরা ছবি পেতে যে ফিল্ম ব্যবহার করি তাতে মাখানো থাকে মিলডার হ্যালাইড গ্রেনস্। যাতে আলো পড়লে ঘটে এক রাসায়নিক পরিবর্তন যা বিভিন্ন অ্যালক্যালির সংস্পর্শে নির্মিত ডেভেলপারের সংস্পর্শে ছবি হিসেবে ফুটে ওঠে। ফিল্মের যেখানে যেখানে আলো লাগে ডেভলপার সেখানে সেখানে মিলডা হ্যালাইডকে ধাতব মিলডারে পরিণত করে কালো করে দেয়।

জেরক্সের ক্ষেত্রেও একটি জেরোগ্রাফি প্লেট ব্যবহার করা হয়। এই প্লেটটিকে আলোক সংবেদনশীল করে তুলতে হয় কে রোনা চারজিং মেশিনের ভিতর রেখে। কোরোনা ছড়িয়ে পড়ে প্লেটের ওপর এবং তার উপরে প্রবাহিত করা হয় বিদ্যুৎশক্তি। ফলে প্লেটটিতে ফটোকনডাকটিভিটি জন্ম নেয়। এই মেন স্টোইজিং করা থেকে ডেভলপিং করা পর্যন্ত ঘরটি অন্ধকার থাকে অর্থাৎ ডার্করুমে এই কাজ করা হয়। প্লেটটিকে আলোকসংবেদনশীল করে তোলার পর একে আলোকায়িত করে তোলা হয় আসল প্রতিলিপির সামনে।

এই আলোকায়িত করার কাজটি কোথাও ক্যামেরার সামনে করা হয়। এই ক্যামেরা কিন্তু মিনিয়েচার ক্যামেরা নয়। কোথাও আবার কনট্রাক্ট প্রিণ্ট করা হয়। আলোকসংবেদনশীল জেরোগ্রাফিপ্লেটে প্রতিলিপির যেখান থেকে যতটা পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয় সেখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ অপসারিত হয় এবং বিপরীতভাবে যেখানে আলো লাগে না সেখানে আলোক সংবেদনশীলতা থেকে যায়। এই অবস্থায় জেরোগ্রাফি প্লেটে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইমেজ সৃষ্টি হয়।

পরের দশায় প্লেটটিকে পরিস্ফুটিত করতে হয়। দুইটি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে এই পরিস্ফুটক তৈরি হয়। একটি খুব মিহিগুঁড়া যার নাম টোনার এবং অন্যটি অপেক্ষাকৃত মোটা গুঁড়া যার নাম ক্যারিয়ার। এই দুটি পাউডার জেরোগ্রাফি প্লেটের উপর ছড়িয়ে দেওয়ার পর ক্যারিয়ার টোনারের উপর তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে এবং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইমেজের বিপরীতে পাউডার ইমেজটিকে ডেভেলপ করতে থাকে। এই পরিস্ফুটনের কাজটি পাউডার ক্লাউডের সাহায্যে করা যায়।

এরপরে ছাপার কাজ। এটা করা হয় ফিজিক্যালি প্রসেসে সহজ ট্রানস্ফার মেথডে। এতে মুখ্য ভূমিকা নেয় বিদ্যুৎশক্তি। তড়িতাকর্ষণে জেরোগ্রাফি প্লেট থেকে কাগজে ছাপটি বদলী হয়ে যায়। যেকোন ধরণের কাগজ জেরোগ্রাফি প্লেটের উপর রেখে সেটি কোরোনা চারজিং ডিভাইস স্থাপন করা হয়। তারপর কাগজের উপর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয় এবং প্লেট থেকে প্রতিবিম্বরূপে পাউডার এসে কাগজে জমে। সেটাকেই আমরা আসলের প্রতিলিপি হিসাবে পাই। কিন্তু এই ছাপটি স্থিতিশীল নয়। হাত লাগলে পাউডার ছড়িয়ে ছাপটি নোংরা হয়ে যেতে পারে। তাই ছাপটি স্থিতিশীল করতে হয় ফিক্সিং ইউনিটে রেখে। ফিক্স করার জন্য তাপপ্রবাহ বা মলডেণ্ট বাষ্প ব্যবহার করা হয়। যার তাপে পাউডার প্রতিবিম্বটি ফিউজ হয়ে জমে যায় আবার পরবর্তী কাজে জেরোগ্রাফি প্লেটটিকে নতুন করে ব্যবহার করার জন্য গ্রানুলার পাউডারর মধ্যে নাড়াচাড়া করে পরিষ্কার করা হয়।

বিদ্যার আরাধ্য দেবী বীণাপাণির অতি প্রিয় পীত, রঙের গাঁদাফুল। তাই সকলেরই এই ফুলটি খুবই পরিচিত।

এই ফুলটির আদিনিবাস আমেরিকার মেক্সিকোতে। ইংরাজীতে মেরীগোল্ড নামে পরিচিত। বাংলা, হিন্দি পাঞ্জাবীতে গাঁদা, তেলেগুতে বাণ্টি, গুজরাটিতে গুলজাজারি, মারাঠীতে তুরুক্কাসামানন্তি বলে।

এই গাঁদাফুলের পাঁচটি প্রজাতি আছে। তন্মধ্যে বড় বড় গাঁদাগুলিকে ইংরাজীতে আফ্রিকান মেরীগোল্ড ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় টাজেটেস ইরেক্টা বলে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনিয়স প্রথম এই গাছটির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করেন। অ্যাসটারেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গাঁদা ফুলকে ফুল বললেও এটি অনেকগুলি ছোট ছোট ফুলের সমষ্টি। প্রত্যেকটি পাঁপড়ি এক একটি ছোট ফুল। এই ছোট ছোট ফুলগুলিকে পুষ্পিকা বা ফ্লোরেট বলে। প্রান্তের দিকের পুষ্পিকাকে প্রান্তপুষ্পিকা। এইগুলি কিঞ্চিৎ বড় হয় এবং মধ্যিখানের পুষ্পিকাকে মধ্যপুষ্পিকা বলা হয় ও এইগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট হয় কিন্তু আগাটি বিস্তৃত হয়ে সাধারণতঃ কুব্জপৃষ্ঠ পুষ্পাধারে পরিণত হয়। তার মধ্যেই পুষ্পিকাগুলি বিন্যস্ত থাকে এবং মঞ্জরী-পত্রাবরণ দিয়ে ঘেরা থাকে বলে পুষ্পবিন্যাসটি একটি ফুল বলে মনে হয়। এই বিশেষ পুষ্পবিন্যাসের নামকরণ ক্যাপিটিউলম। এটি অ্যাসটারেসী গোত্রের বৈশিষ্ট্য।

আফ্রিকান গাঁদাফুলে প্রান্তপুষ্পিকা ও মধ্যপুষ্পিকার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা যায় না, কিন্তু অন্য প্রজাতির গাঁদাফুলে যেমন ফ্রেঞ্চ মেরীগোল্ডের ক্ষেত্রে প্রান্ত ও মধ্য পুষ্পিকার মধ্যে আকৃতির ব্যবধান সহজেই নজরে পড়বে। এই আফ্রিকান গাঁদাফুল বর্ষজীবী বীরুৎ যাকে ইংরাজীতে হার্ব বলে। লম্বায় প্রায় 60 সে.মি. হয়। পাতাগুলির একটি অংশ প্রায় 1·5 সে.মি. লম্বা হয় এবং ধারগুলি খাঁজকাটা হয়। আর এক একটি ফুল প্রায় 5-10 সে.মি. ব্যাসযুক্ত, উজ্জ্বল হলুদ ও কমলা দুই রঙেরই হয়।

এই গাঁদাফুল থেকে হলুদ রঙের রঞ্জন তৈরি হয়, যদিও এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই হলুদ রঙের নাম জেনডিয়া।

গাঁদাফুল কেবলমাত্র টবের সৌন্দর্য বাড়ায় না আবার ঔষধি গাছও বটে।

রক্তমোক্ষণ অর্শে, ক্ষতে এই ফুলের পাঁপড়ির রস প্রয়োগ হয়।

গাঁদা গাছের পাতা বেটে ফোঁড়া বা কার্বাঙ্কলে লাগালে উপশম হয়। তাছাড়া কাটাছেঁড়াতে পাতার রস দিলে উপকার হয়।

[ফটো তুলেছেন সুবলকৃষ্ণ দে]

আই-কিউ-টেস্ট সেপ্টেম্বর '86

1. বলতো এঁরা কে কোন দেশের নাগরিক—

(a) টমাস আলভা এডিসন, (b) কনফুসিয়স, (c) আইজ্যাক নিউটন, (d) মাদাম কুরি, (e) সিগমণ্ড ফ্রয়েড, (f) দাদাভাই নওরোজী, (g) মাদাম মন্তেসরি, (h) ওমর খৈয়াম, (i) রাসপুটিন।

2. অনেকেই প্রত্যহ সকালে সংবাদপত্র পাঠ করেন, কারণ —

(a) এটা তাদের বহুদিনের অভ্যাস।

(b) শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংবাদপত্র পড়বেন,—এটাই স্বাভাবিক।

(c) তাঁরা বিজ্ঞাপনগুলি দেখতে ভালবাসেন।

(d) তাঁরা রোজ টাটকা খবরগুলি জানতে চান।

3. স্ট্রিকনিন একটি—

(a) উদ্বায়ী তেল, (b) উপক্ষার, (c) ল্যাটেক্স, (d) এদের কোনটিই নয়।

4. নিচের কোন কারণটির জন্য বিশুদ্ধ জল তড়িতের কু-পরিবাহী—

(a) বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংক কম।

(b) বিশুদ্ধ জল প্রশম তরল।

(c) বিশুদ্ধ জলের কম সংখ্যক অণু আয়নিত হয়।

(d) এদের কোনটিই নয়।

5. রাগবি খেলায় একটি দলে কতজন খেলোয়াড় থাকে ?

(a) 11 জন, (b) 12 জন, (c) 15 জন, (d) 16 জন।

আই-কিউ-টেস্ট/জুলাই '86-এর সমাধান

1. (c) বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।
2. (iii) CDAEB.
3. (b) 98·89%
4. (c) জলের আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় সমপরিমাণ তাপগ্রহণ অথবা বর্জনের ফলে জলের তাপমাত্রার পরিবর্তন স্থলভাগের তাপমাত্রার চাইতে কম হয়, এবং এর ফলস্বরূপ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তনও অভ্যন্তরীণ স্থলভাগের বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তনের চাইতে কম হয়।
5. (a) কেবল (iii) সত্য।

ভূগর্ভের সম্পদ

জিংকাইট

যে রঙীন ছবিটি এই পৃষ্ঠায় রয়েছে, নাম তার 'জিংকাইট'। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি হলো জিংক অর্থাৎ দস্তার একটি খনিজ। রসায়ন বিজ্ঞানীদের ভাষায় এর নাম 'রেড অক্সাইড অফ জিংক', আণবিক সংকেত ZnO. এই যৌগটিতে দস্তা আছে শতকরা 80·3 ভাগ এবং অক্সিজেন আছে শতকরা 19·7 ভাগ।

এই মণিকটির কেলাস ষড়তল পিরামিডাকার, যার ভূমিতে একটিমাত্র তল বিদ্যমান। জিংকাইটের কেলাসে দুর্বলতা তলগুলি (যে তল বরাবর কেলাসটি সহজেই ভেঙ্গে যায়) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চেনা যায়। দুর্বলতা-তল ছাড়া এই মণিকের অন্য যে কোন ভগ্নতলে ভাঙ্গা কাচের মত আকার দেখতে পাওয়া যায়। মোজ (Moh's) স্কেল অনুযায়ী এই খনিজটির কাঠিন্য 4 থেকে 4·5-এর

মধ্যে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 5·43 হতে 5·7-এর মধ্যে। চোখ ধাঁধানো ধাতব দ্যুতি দেখেও জিংকাইটকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। খনিজটি স্বচ্ছ হলেও গাঢ় হলুদ, কমলা বা গাঢ় লাল রঙের হয়। 'জিংকাইট' সাধারণতঃ একা থাকে না, একে হামেশাই ফ্র্যাঙ্কলিনাইট ও উইলেমাইটের সাথে দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বে যে সব জায়গায় জিংকাইট পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ফ্র্যাঙ্কলিন ও স্টার্লিং হিল অঞ্চলের দস্তার ভাঁড়ার, সাসেক্স কাউণ্টি, নিউ জার্সি, কলেরাডো, স্পেন, ইটালী, পোল্যাণ্ড ও টাসমানিয়া। আমাদের দেশে কিন্তু দস্তা নিষ্কাশনের জন্যে প্রধান আকরিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় জিংক ব্লেণ্ড, জিংকাইট নয়।

অমরনাথ রায়

জুনিয়র কুইজ কনটেস্ট

সেপ্টেম্বর 1986 ॥ মান : VI – VIII

1. জীব বিজ্ঞানে পায়রার বৈজ্ঞানিক নাম কি ?
2. পাতার ফলককে ধরে রাখে কে ?
3. 'মহেঞ্জোদড়ো' শব্দের অর্থ কি ?
4. কোন্ শিল্পী এথেনা দেবীর ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করেছিলেন ?
5. আরব দেশের যাযাবরদের কি নামে অভিহিত করা হতো ?
6. ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে ?
7. তাপীয় আয়ননবাদের আবিষ্কর্তা কে ?
8. 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' নামক যৌগটি আবিষ্কার করেন কে ?
9. আগুন নেভাবার জন্যে কোন্ গ্যাস ব্যবহার করা হয় ?
10. নিচের কোন্‌টি উপগ্রহ ?
    (ক) সূর্য (খ) শুক্র (গ চন্দ্র
11. কোন্ তারিখে দিন সবচেয়ে বড় ও রাত্রি সবচেয়ে ছোট ?

জুনিয়র ফটো কুইজ

নিচের ছবিটি কার বলতে পার ?

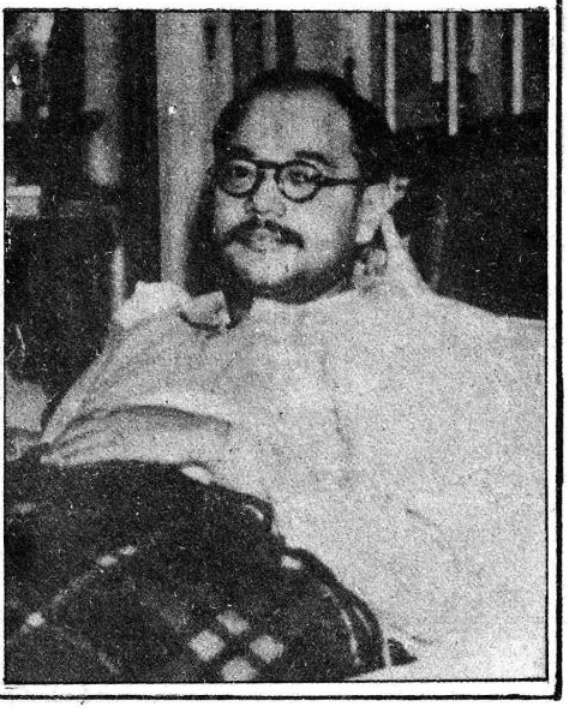

জুলাই-এ প্রকাশিত জুনিয়ার কুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান।

1. মন্বন্তর। 2. (খ) তাল। 3. (ক) উদ্ভিদ কোষে। 4. মহাকবি হোমার। 5. হোয়াং হো। 6. ঋকবেদ। 7. অক্টেভিয়ান। 8. গুরু গোবিন্দ সিংহ। 9. বিজ্ঞানী জন ডালটন। 12. রুশীয় সাইবেরিয়ার ভারখয়ানস্ক। 11. পোলো খেলায়। 12. ফোটো কুইজের সমাধান এ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা। 13. গোয়ালিয়র দুর্গের একাংশ।

পূজা সংখ্যায় রঙিন ফিচার কার্টুন ও কমিকস।

★ গৌতম কর্মকার
★ রেবতীভূষণ ঘোষ
★ শৈল চক্রবর্তী
★ সমীর মণ্ডল
★ দিলীপ দাস

ডাক্ বিল্ড্ প্লাটিপাস

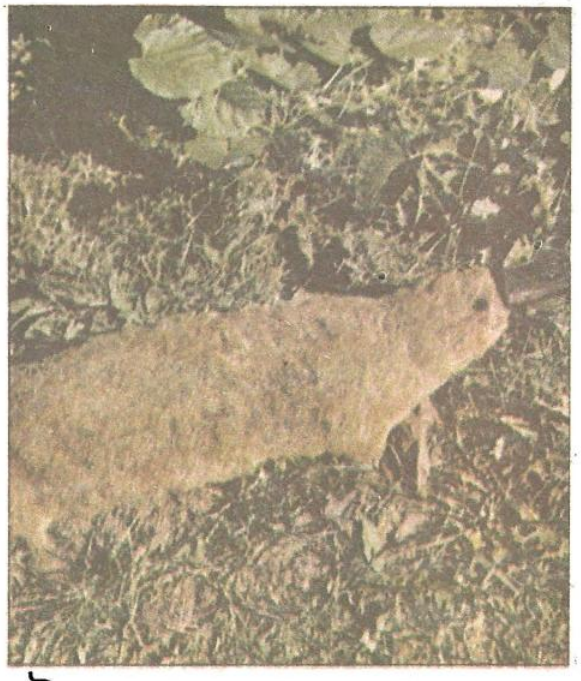

ইংরেজী নাম 'ডাক্ বিল্ড্ প্লাটিপাস', বাংলায় 'হাঁসঠুঁটো।' ঠোঁটটি পাতিহাঁসের মত। পায়ের আঙ্গুলগুলিও হাঁসের পায়ের আঙ্গুলের মত পরস্পর জোড়া লাগা। তাতে করে জলে সাঁতার কাটার সুবিধে হয়। এটি কিন্তু আমাদের দেশের প্রাণী নয়। অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমেনিয়াতেই এদের বাস। এদের সর্বাঙ্গ ঘন লোমে ঢাকা। গায়ের রং ঘোর কটা। চোখ দুটি ছোট। কান আছে, তবে তা আমাদের কানের মত দু' পাশে বেরিয়ে থাকে না। মুখে দাঁত নেই। পায়ে নখ আছে। সাধারণত নদীর ধারে মাটিতে গর্তের মধ্যে এরা বাস করে। নদীর জলে সাঁতার কাটে, আবার সেই জল থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এক একটি হাঁসঠুঁটো এক ফুটেরও কিছু বেশি লম্বা হয়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী, তবে স্ত্রী হাঁসঠুঁটোর স্তনে বোঁটা নেই। লোমে ঢাকা স্তন। কতকগুলি লোমের গোড়ায় ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে লোম বেয়ে দুধ আসে বাচ্চাদের মুখে। স্তন্যপায়ী জীব হলেও হাঁসঠুঁটো কিন্তু ডিম পাড়ে। ডিমগুলি, ও পরে তা ফুটে বাচ্চা বেরুলে মা হাঁসঠুঁটো সেগুলিকে একটি থলিতে তুলে রাখে। এই থলি থাকে স্ত্রী-হাঁসঠুঁটোর পেটের তলায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্ত সাধারণতঃ গরম হয়ে থাকে। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও হাঁসঠুঁটোর দেহের রক্ত বেশ ঠাণ্ডা। বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী নয় কি এই হাঁসঠুঁটো ?

পেলিক্যান

ছবিতে তোমরা যে পাখিগুলোকে দেখতে পাচ্ছ, তারা হলো 'সাদা পেলিক্যান'। মিসিসিপি উপত্যকায় ও কানাডায় সাদা পেলিক্যান দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে সাদা হলেও এদের ডানার প্রান্তভাগ কালো আর বুকের রং নোংরাটে সাদা। পেলিকানকে বাংলায় আমরা 'গগনবেড়' বলে থাকি। ভারতীয় পেলিক্যানের চোখের রঙ কতকটা হলদে-সাদা। চোখটিকে ঘিরে চামড়ার উপরে একটি সোনালী বৃত্ত আঁকা থাকে। বাদামী পেলিক্যানদের দেখা যায় পশ্চিম কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকায়। পেলিক্যানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বিশাল ঠোঁট। ঠোঁট চ্যাপ্টা ও তার আগা বঁড়শির মত বাঁকা। নিচের ঠোঁটের ডগা থেকে গলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে একটি বড় থলি। এই থলিতে পেলিক্যান মাছ ও দরকার মত কিছু জল ভরে রাখে। সাধারণ এক একটি পেলিক্যান প্রায় পাঁচফুট লম্বা হয়ে থাকে। ওজন ছয় কি সাত কিলোগ্রাম মতো হবে। পেলিক্যানের গলাটি লম্বা ও সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পায়ের চারটি আঙ্গুল পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পর জোড়া লাগানো থাকে। এদের দেহের হাড়গুলি সচ্ছিদ্র ও কমবেশি বায়ুপূর্ণ। এদের ফুসফুস সংলগ্ন কয়েকটি বায়ুথলি বেশ বড়। এরা কখনও একা, কখনও বা দল বেঁধে চরে। আকাশে ওড়ে ইংরেজী V অক্ষরের আকারে দল বেঁধে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এদের বাস।

অমরনাথ রায়

জুলাই '86 এর আই কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ঃ

1. দীপ্তিরানী সামন্ত
প্রযত্নে ঃ হরেকৃষ্ণ সামন্ত
1/99, বিজয় গড়, যাদবপুর, কল-32

2. মধুমিতা সাহা
প্রযত্নে ঃ গুরুদাস সাহা
পি / টি কোয়ার্টার 6, টাইপ III
উল্টোডাঙা, কলকাতা-67

3. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
জয়রামপুর, শুকদেবপুর
সাউথ 24 পরগনা —743503

4. মলয় দাস
প্রযত্নে ঃ জি. এন. নস্কর
5/8, বুড়োশিবতলা মেইন রোড
কলকাতা-38

5. প্রমিত ঘোষ
মিলন সঙ্কট, বন্দিপুর
রহড়া, উত্তর 24 পরগনা-743186

6. শুদ্ধকল্যাণ পাল
প্রযত্নে ঃ দিলীপ কুমার পাল
প্রতাপবাগান গভঃ হাউসিং এস্টেট
ফ্ল্যাট A2/1, পোঃ+জেলাঃ বাঁকুড়া

7. সুধাংশু ঘোষ
A/3—4/2, ভি. কে. নগর
দুর্গাপুর 10, বর্ধমান

8. জয়ন্ত দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ রামশঙ্কর দেবনাথ
গ্রাম ঃ উখড়া, পোঃ উখড়া, সরংপুর
ভায়া ঃ পাটুলি, বর্ধমান, পিন ঃ 713512

9. ইন্দ্রনীল মৌলিক
প্রযত্নে ঃ এস. এন. মৌলিক
ব্লক S/II/13, ইউনিট 3
নিউ ডেভেলাপমেণ্ট, পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর

10. নীলাদ্রি নাথ
প্রযত্নে এন. নাথ
আর. কে. কলেজ, কৈলাশহর
ত্রিপুরা (উত্তর)-799277

জুলাই '86 তে প্রকাশিত সিনিয়র কুইজ কনটেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. অনুপম বসু সরকার
প্রযত্নে ঃ অম্লান কান্তি বসু সরকার
কাঁটাপুকুর, পোঃ মগরা, জেঃ হুগলী-712148

2. সৌমক নাথ
প্রযত্নে ঃ বিনোদ নাথ
পোঃ সমবায়পল্লী, (বালী), হাওড়া

3. সৌম্য ভট্টাচার্য
N/Q-6, ডানলপ কোয়ার্টার্স, পোঃ সাহাগঞ্জ, হুগলী

জুলাই '86-তে প্রকাশিত সিনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে মাত্র একজন ঃ

শাশ্বত ভট্টাচার্য প্রযত্নে ঃ আর. এন. ভট্টাচার্য, 10 মধ্যপাড়া, পোঃ রহড়া, উত্তর 24 পরগনা 743186

জুলাই '86-তে প্রকাশিত সিনিয়র কুইজ কনটেস্টে সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ কৌশিক বাগচি, রূপা বিশ্বাস, তুলি মুখার্জি, নির্মল কুমার সোম, সব্যসাচী বিশ্বাস।
24-পরগনা ঃ রুদ্রপ্রসাদ হালদার, স্বপন ভাণ্ডারী, শিবাশিস ঘোষ, মলয় কুমার বৈদ্য, সমীর নস্কর।
নদীয়া ঃ মৈত্রেয় মণ্ডল, সিদ্ধার্থশঙ্কর দত্ত, ঋত্বিক চক্রবর্তী, মনোজিৎ ইন্দ্র।
মুর্শিদাবাদ ঃ রতন কুমার সাহা, চঞ্চল অধিকারী।
পঃ দিনাজপুর ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জী।
হাওড়া ঃ প্রসেনজিৎ সিংহ, বরুণ বিশ্বাস, সুদীপ্তা সাহা।
হুগলী ঃ পিয়ালি সরকার।
মেদিনীপুর ঃ অভিজিৎ সরকার, চৈতালি কুণ্ডু, রবিশংকর দাস, দিলীপ দাস, জয়েস মাইতি, সুভাশীষ দে।
বীরভূম ঃ গৌর জ্যোতি ভট্টাচার্য।
বর্ধমান ঃ গুরুসদয় দত্ত, পার্থপ্রতিম লাহা।

জুলাই '86-তে প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টে—সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**
19/1, আর. এন. টি. রোড
পোঃ ও গ্রাম ঃ হরিনাভি, 24 পরগনা

2. **জয়ন্ত ধর**
প্রযত্নে ঃ গোপীনাথ ধর
15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-3

3. **অপর্ণা বিশ্বাস** প্রযত্নে ঃ সূর্যকান্ত বিশ্বাস, গ্রাম ঃ জগৎবল্লভপুর পোঃ জগৎবল্লভপুর হাওড়া

জুলাই '86 জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ সুদীপ পাল, শুক্লা চৌধুরী, অপর্ণা চক্রবর্তী।
24-পরগনা ঃ শ্রীকুমার দে, অরূপ ঢালী।
মেদিনীপুর ঃ অপূর্বকুমার সামন্ত, সীমা গুছাইত, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার।
হুগলী ঃ মহুয়া গোস্বামী।
বর্ধমান ঃ সুকান্ত তলাপাত্র, কাকলি রাক্ষিত।
নদীয়া ঃ মৈত্রেয় মণ্ডল।
বাঁকুড়া ঃ শুদ্ধকল্যাণ পাল, সব্যসাচী লোহার।
জলপাইগুড়ি ঃ সিদ্ধেশ্বর দাস।
দার্জিলিং ঃ ধ্রুবদাস মহলানবিস।
পঃ দিনাজপুর ঃ তমাল সান্যাল।

জুলাই '86-তে প্রকাশিত জুনিয়র ফটো ক্যুইজ এর সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে মাত্র একজন ঃ

সৌরভ বসু, হেয়ার স্কুল, কলকাতা

সিনিয়র, জুনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট ও আই কিউ টেস্ট-এর উত্তরদাতা ও সকল প্রতিযোগীদের প্রতি ঃ

এক ঃ যে কোন উত্তরপত্রে একটি মাত্র প্রতিযোগিতার উত্তর লিখবে। একটি উত্তর পত্রে একাধিক প্রতিযোগিতার উত্তর লিখবে না।

দুই ঃ প্রতিটি উত্তরপত্রেই উত্তরদাতার নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে থাকা চাই। শুধুমাত্র স্কুলের নাম ঠিকানাই নয় বাড়ীর ঠিকানাও থাকা দরকার।

তিন ঃ শ্রেণী অনুযায়ী সিনিয়র অথবা জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এ যোগদান করবে—এক সঙ্গে সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টে যোগদান করা যাবে না।

চার ঃ মে '86 থেকে প্রকাশিত ফলের ভিত্তিতে সকল প্রতিযোগীদের আগামী এপ্রিল অথবা মে '87-তে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার অর্পণ করা হবে। ঠিকানা অসম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে অথবা কেউ বাড়ীর ঠিকানা পরিবর্তন করলে অবশ্যই দপ্তরে যোগাযোগ করবে।

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর

নতুন ডিস্‌কো লাইট

দীপেন ভট্টাচার্য

আমার ইলেকট্রনিক্‌সের বন্ধু হীরা বলছিল এমন একটা ডিস্‌কো লাইটের সারকিট তৈরি করতে যেটা খুব কম খরচে করা যায়, খুব কম ভোল্টে চলবে, আবোল তাবোল ভাবে L.E.D. গুলো জ্বলা নেভা করবে। আমি বোধহয় ওর মনের মতনই সারকিটটি তৈরি করতে পেরেছি। যারা ইলেকট্রনিক্‌স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ তাদের আশা করি এই সারকিটটি খুব কাজে আসবে। কারণ এতদিন তোমরা যে সব ডিস্‌কো লাইটের সারকিট দেখেছ (IC বা Transistor-এর) সেগুলো অনেক বেশি ভোল্টের সারকিটই নয়, তাতে মাত্র 6 টি L.E.D. কে দুটি সেটে ভাগ করে অলটারনেটলি জ্বালানো নেভানো যায়, অর্থাৎ তিনটি ল্যাম্প (ধর লাল) যখন জ্বলে, অপর তিনটি (সবুজ) তখন নিভে থাকে। এদিক থেকে আমার সারকিটটি মাত্র 3 ভোল্টেই যেমন চলে, বেশি সংখ্যক L.E.D. কে অভিনব কায়দায় জ্বলানো নেভানো যায়। কারণ, L.E.D. গুলোকে 6 টি সেটে ভাগ করা হয়েছে। একটি জ্বলে ওঠার বিভিন্ন সময় পরে অন্যান্য 5 টি সেট জ্বলে ওঠে, নিভে যায়। একই পদ্ধতিতে কন্‌ডেন্‌সার-এর মান কমিয়ে (ধর 30μf, 100μf, 220μf এর স্থলে যথাক্রমে 10μf, 30μf, 100μf দিতে পার) L.E.D. গুলো দ্রুত জ্বালানো নেভানো যায়।

করেই দেখ না, কি রকম মজার মজার ভাবে L.E.D. জ্বলা নেভা করে।

প্রথমে চাঁদনী চক বা Madan Street থেকে বা যে কোন বড় ইলেক্‌ট্রনিকসের দোকান থেকে এর Components কিনে ফেল। তারপর সারকিট দেখে ঠিক ঠিক ভাবে ঝালাই করে L.E.D. গুলোকে নিজের মত সাজিয়ে নাও। তারপর ভোল্ট দিয়ে দেখ তো। খরচ ষোল টাকার মত।

COMPONENTS

1. Tr_1, Tr_2, Tr_3 – BC148B
   (এটি ভালো কাজ করে, দামও কম)
2. C_1, C_2, C_3—যথাক্রমে 220μf, 100μf, 30μf (6—12 v.)
3. R_1, R_2, R_3—680Ω
   R_4, R_5, R_6—47kΩ
4. L.E.D.—D 1, 2, 4, 5, 7,8 (Red)
   —D 3, 6, 9 (Green)
   (এগুলি ছোট হলেই ভালো হয়)

বিঃ দ্রঃ—কি করে হয় বা অন্য কোন বেশি খরচের Lighting (Electronic) সারকিট-এর দরকার হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার।

ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাই স্কুল, বিজ্ঞান বিভাগ

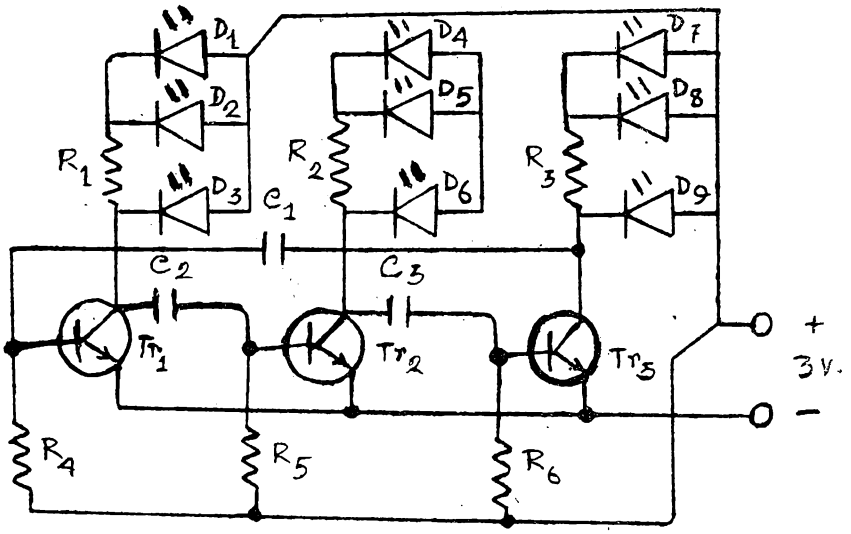

CIRCUIT DIAGRAM

অঙ্ক থেকে মজা

নন্দলাল মাইতি

অঙ্কে মজা আছে। কিন্তু এ-মজা গল্প, রহস্য, কাহিনী অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদির মজা থেকে আলাদা। অঙ্কের মজা বুদ্ধির কাছে—হৃদয়ের কাছে নয়। বুদ্ধির খেলাতে চিন্তা ভাবনার দরকার হয়। তাই আমরা অনেকে অঙ্কের মজায় আনন্দ পাই না। কিন্তু কঠিন বা দুরূহকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে তো এক রকম আনন্দ আছে। তাই তো মানুষ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে, সমুদ্রে পাড়ি দেয়, আরো কতভাবেই না জীবনের ঝুঁকি নেয়। অঙ্ক কষতে অবশ্য ও সবের ঝামেলা নেই, কিন্তু নিজের বুদ্ধির প্রতি একরকম চ্যালেঞ্জ আছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারলে আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। এটা কম লাভ নয়।

আমরা এখানে এমন একটি অঙ্কের কথা বলব যা থেকে মজা পাওয়া যায়—বুদ্ধি খেলানো যায়।

আয়তক্ষেত্র কাকে বলে আমরা সবাই জানি। শুধু তাই নয়, 'আয়তক্ষেত্র' নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে তার ছবিটিও ভেসে ওঠে। আমাদের অঙ্কটি এই আয়তক্ষেত্র সম্পর্কে।

অঙ্ক ঃ এমন একটি সংখ্যা বল যা দিয়ে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল সূচিত করা যায়।

দেখ, সমস্যাটির সমাধান কোন দিক থেকে করব, এই চিন্তাভাবনাই প্রথম চ্যালেঞ্জ। কিভাবে এর মোকাবিলা করা যায়? মনে রাখতে হবে, যে কোন অঙ্কের সমাধান কেবল একটি নিয়মে বা পদ্ধতিতেই হয় না।—নানাভাবে হতে পারে। তবে যে-ভাবেই হোক, তা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই। এখানে আমরা একটি সূত্র দিচ্ছি ঃ

আমরা সকলেরই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি।

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2 (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ঃ প্রদত্ত অঙ্কে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কারুর মানই দেওয়া নেই। তা হলে কোন দিক থেকে সমাধানের পথে অগ্রসর হবো? দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুটি অজ্ঞাত বলে বীজগাণিতিক পথে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমরা জানি, অজ্ঞাত রাশির মান বার করতে হলে বীজগাণিতিক সমীকরণ গঠন করতে হবে। তা হলে আর একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। কিভাবে এই সমীকরণ গঠিত হবে? প্রচলিত রীতি অনুসারে অজ্ঞাত রাশিকে x, y ইত্যাদি ধরা হয়।

মনে করা যাক,

দৈর্ঘ্য = x, প্রস্থ = y

অতএব, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $x \times y$.....(1)

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = $2(x+y)$ .....(2)

এবার, অঙ্কের শর্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় 1 ও 2-এর সংখ্যামান সমান। সুতরাং

$xy = 2(x+y)$

বা, $xy - 2(x+y) = 0$ [পক্ষান্তর করে]

বা, $xy - 2x - 2y = 0$

বা, $xy - 2x - 2y + 4 = 4$ [উভয় পক্ষে 4 যোগ করে।

বা, $x(y-2) - 2(y-2) = 4$

বা, $(y-2)(x-2) = 4$

সমীকরণ গঠনের পর শেষ সোপানের আগে আমরা একটি বড় রকম চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছিলাম। তা হলো উভয় পক্ষে [4] যোগ করব কেন? এর উত্তরে বলা যায়, সমীকরণ সমাধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর তা করতে হলে বাম দিকের রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই বাম দিকে 4-এর প্রয়োজন। সুতরাং সমতা রক্ষার জন্যে ডান দিকে 4 যোগ করতেই হয়।

শেষ সোপানে এসে পৌঁচেছি আমরা। কিন্তু এবার x ও y-এর মান নির্ণয় করব কি করে? শেষ সোপানের অর্থ কি? আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে 2 বিয়োগ করে গুণ করলে গুণফল 4 হয়। 4-কে দু-রকমভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ 2×2 ও 1×4 ; তা হলে,

$x-2=2$, $y-2=2$ হবে, না হয় $x-2=4$, $y-2=1$ হবে।

$\therefore$ $x=4$, $y=4$, আবার, $x=6$, $y=3$

আমরা আয়তক্ষেত্রের কথা বলেছি বলে তার ক্ষেত্রফল ও পরিসীমার সংখ্যামান = 18। x ও y-এর অন্য মান থেকে দেখা যাচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমার মান = 16 হবে।

ঠাকুরানীচক, হুগলী, 712613

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ (1) পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে মতবাদগুলি জানতে চাই। প্রদীপ ভট্টাচার্য, বল্লভপুর, বর্ধমান।

(2) সূর্য থেকে কেমন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে? অভিজিৎ মণ্ডল, মাণিকপুর, বীরভূম।

উঃ—পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মতবাদ আছে। তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি মতবাদের এখানে আলোচনা করা হল।

প্রথম বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ রেখেছিলেন স্যার জেমস জীনস ও হ্যারল্ড জেফ্রিস। এঁদের মতে সুদূর অতীতে সূর্য অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে বৃহত্তর একটি ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র মহাকাশ পরিক্রমা করতে করতে সূর্যের সমীপবর্তী হয়েছিল। তারপর সে যখন সূর্যকে অতিক্রম করে যায় তখন তার প্রবল আকর্ষণ বলের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সূর্যদেহের এক বিরাট অংশ। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সে সাথে করে নিয়ে যেতে পারেনি। সূর্যেরই আকর্ষণের আওতায় থেকে যায়। ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই কালক্রমে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে।

জীনসের উপরোক্ত মতবাদটি প্রথম প্রথম স্বীকৃতি লাভ করলেও পরের দিনে পরিত্যক্ত হয়েছে। পরিত্যাগের কারণ (1) বিশ্বজগৎ নিয়মে বাঁধা। কোন নক্ষত্র যত বড় কিংবা যতই স্বেচ্ছাচারী হোক না কেন, তার ছুটে চলার মধ্যে নিয়ম অবশ্যই থাকবে। যেখানে খুশি যেতে সে পারে না। (২) অনুরূপ উপায়ে সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে যদি গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হতো তাহলে সব গ্রহ-উপগ্রহের গঠন উপাদান একই হতো। কিন্তু দেখা গেছে, বুধ থেকে মংগল ও কয়েকটি গ্রহাণু পর্যন্ত গ্রহ উপগ্রহের উপাদান প্রধানত লৌহশিলা; অবশিষ্ট গ্রহাণু, বৃহস্পতি, শনি ও তাদের উপগ্রহগুলিতে তেল ও জলের প্রাধান্য; আর সুদূরের গ্রহগুলির উপাদান প্রধানতঃ নিয়ন ও মিথেন। (3) সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুর পরিমাণ সামান্যই। শতকরা মাত্র এক ভাগের মত। জীনসের মতবাদ সঠিক হলে সূর্যের উপাদানের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহদের উপাদানের বেশ কিছুটা মিল দেখা যেত।

জীনসের পরে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে তাদের মধ্যে দুটি মতবাদ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটির প্রবক্তা জার্মান বিজ্ঞানী কার্লফন উইৎসেকার এবং অপরটির ফ্রেড হয়েল উইৎসেকারের মতবাদটি উল্কামতবাদ এবং হয়েলের মতবাদটি বলয় মতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। যদিও দুটি মতেরই কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। উল্কা মতবাদ অনুযায়ী যে সুবৃহৎ গ্যাস ও ধূলির মেঘ থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছিল তার বাইরেও অবশেষরূপে থেকে গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ধূলি ও গ্যাসের ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ। সেগুলি নবীন সূর্যের প্রবল আকর্ষণের আওতায় থেকে আপন আপন বৃত্তাভাস পথে সূর্যকেই পরিক্রমা করতে শুরু করে। সংখ্যায় তারা ছিল অজস্র। কিন্তু কক্ষপথ কারও সমতলে না থাকায় অধিকাংশের পথ একে অপরকে ছেদ করেছিল। ফলে অহরহ সংঘর্ষে ছোট ছোট কণা একে অপরের গায়ে আটকে গিয়ে ধীরে ধীরে এক একটির কলেবর বেড়ে উঠে। আবার যারা এইভাবে কলেবর বাড়াতে বাড়াতে বেশ বড় হয়ে উঠল তাদের মধ্যে প্রকাশ পেল আকর্ষণ বল। তারা তখন পাশাপাশি ছোট বড় বস্তুপিণ্ডকে আত্মসাৎ করে ক্রমশঃ বড় হল এবং আকর্ষণ বলকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করল। এইভাবে সৃষ্টি হল এক একটি সুবৃহৎ বস্তুপিণ্ড এবং তারা প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি ও পরিবেশ অনুযায়ী বন্দী করল ভারী অথবা হালকা এক একটি আবহমণ্ডলকে। পৃথিবীর আকর্ষণে আকাশের উল্কারা যেমন নেমে আসে ঠিক সেইভাবে আদিম বস্তুকণা একে অপরের দেহে হুমড়ি খেয়ে কেন্দ্রীয় কয়েকটি গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি করেছিল বলে উক্ত মতবাদকে বলা হয় উল্কা মতবাদ।

উল্কা মতবাদের মধ্যেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় বলয় মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে। উক্ত মতবাদ অনুযায়ী সূর্য যখন যে গ্যাসীয় স্তূপটি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল তার প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাস ছিল কয়েক লক্ষ কোটি মাইলের মত। অভ্যন্তরীণ কোনও এক অস্থিরতার ফলে স্তূপটি আবর্তন শুরু করে এবং আবর্তনের ফলে সংকুচিত হতে থাকে। তারপর সঙ্কোচনের মাত্রা যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে তখন তার ঘনত্ব এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় অস্বাভাবিক ভাবে। ফলে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা আরও প্রবল হয়, আবর্তন বেগও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে এবং সঙ্কোচনের মাত্রাও ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। তখন স্তূপটি বর্তুলাকার প্রাপ্ত হয়। পরে প্রবলবেগে আবর্তনের দরুন আদিম সূর্যের মেরুদ্বয় চেপে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মধ্যস্থল স্ফীত হয়ে উঠে। এই স্ফীতি যখন চরম অবস্থায় এসে

গেল তখন সূর্য তার পিঠের ঐ বোঝার মত জিনিসটাকে আর ধরে রাখতে পারল না। একদিন বলয়ের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সূর্যদেহ থেকে।

প্রাথমিক অবস্থায় বলয়টি সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবর্তন করতে থাকলেও পরের দিকে তাও সম্ভব হল না। অপরদিকে পিঠের উপর বিশাল আয়তনের এক বলয়কে নিয়ে সূর্যও পারল না তার আবর্তন বেগকে বজায় রাখতে। এক সময় মন্থর হল তার আবর্তন বেগ এবং বলয়টিও তখন সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করল।

মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী উপবৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা শুরু করল। তারপর উল্কামতবাদ অনুযায়ী গঠিত হল ছোটবড় বস্তু পিণ্ড ও পরে গ্রহ ও উপগ্রহ।

বলয় থেকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণা যথা লোহা ও অন্যান্য ধাতু ধাতব অক্সাইড এবং ধাতব সিলিকেট। প্রায় 40 কোটি মাইল পর্যন্ত বলয় এদের ছড়িয়ে গিয়েছিল। এদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বুধ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত গ্রহগুলি। বুধ ও মঙ্গল দু পাশে থাকার জন্য বেশি বস্তুকণাকে সংগ্রহ করতে পারেনি। অপরদিকে শুক্র ও পৃথিবী মাঝখানে থাকায় চারপাশ থেকে বস্তুকণা সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়ায় কলেবর বাড়াতে পেরেছিল।

বলয় আরও দূরে এগিয়ে যাওয়ায় পরপর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল অন্যান্য উপাদান এবং একই উপায়ে সেইসব উপাদান থেকে গড়ে উঠেছে অপরাপর গ্রহগুলি। তবে বলয়ের বেশ কিছু হালকা পদার্থ পুনরায় সূর্যদেহে ফিরেও গেছে।

প্রঃ—মাকড়সার সুতো কি জিনিস? মাকড়সার জালে পোকামাকড়রা আটকে যায় কিন্তু নিজেরা আটকে যায় না কেন? বিশ্বমোহন জানা, আঠিলা পাড়া অনন্তপুর, হাওড়া।

উঃ—মাকড়সার জালের উপাদান ফাই ব্রাইন নামে এক প্রকার প্রোটিন। জালটা অত্যন্ত চটচটে হওয়ায় পোকামাকড়রা আটকে যায়। কিন্তু মাকড়সাদের পায়ে থাকে এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ। তাই চটচটে জালে আটকা তো পড়েই না, অধিকন্তু বেশ দ্রুত এগিয়েও যেতে পারে।

সুধাংশু পাত্র

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

সুমন্ত মুখার্জী

আত্মরক্ষায় বিষ

শার কামড়ের অভিজ্ঞতা সবারই আছে। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছির হুল ফোটানোর যন্ত্রণাও ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। শুয়োপোকার কাঁটার জ্বালাও কি কম? বিছাদের কামড়ে সব সময় প্রাণ সংশয় না হলেও, সাহারা মরুভূমির একজাতীয় ভয়ঙ্কর বিছার কামড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যায়। কিছু জোনাকি আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকার পিঁপড়েরাও বিষাক্ত হুল ফোটানোয় সমান দক্ষ। বড় বড় কাঠ-পিঁপড়েদের অনেকেই আবার দংশনের পরিবর্তে বিষাক্ত ধোঁয়া নিক্ষেপ করতেই বেশি পছন্দ করে।

ক্ষুদ্রতম স্তন্যপায়ীর ফসিল আবিষ্কার

অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী উপত্যকার 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র গবেষকরা সম্প্রতি 14 কোটী বছরের পুরোনো ক্ষুদ্রতম স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল (fossil) আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারটি ভূ-তাত্ত্বিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ফসিলটি 'কোটাথেরিয়াম হালডেন —11' শ্রেণীর।

ভেষজ বালিশ

ভেষজ উদ্ভিদ দিয়ে চীনের একটি সংস্থা যে মাথার বালিশ তৈরি করেছে,—মাথাধরা, জ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, বমি এবং অন্যান্য অসুখ সারাতে সেটি একটি অব্যর্থ দাওয়াই বলে দাবি করেছে 'নিউচায়না' সংবাদ সংস্থা। সাংহাই প্রদেশের 'পুচেং মেডিসিনাল পিলো ফ্যাক্টরী' ওই ধরনের বালিশ তৈরি করেছেন।

মস্তিষ্কের রঙীন ছবি ঃ কমপিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের রঙীন ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন ডাক্তাররা। মস্তিষ্কের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এই পদ্ধতি। সার্জারী ছাড়াই মস্তিষ্কের কোথায় কী হচ্ছে তা জানতে পারবেন ডাক্তাররা। এছাড়া মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারবে।

দুর্গাপুর-5, বর্ধমান।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

সেপ্টেম্বর সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

অদ্রীশ বর্ধনের

কিশোর সায়েন্স ফিকশন

সেপ্টেম্বর সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ফোটো ক্যুইজের উপহার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

আমাজনের অরণ্যে

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটোক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

বয়স.....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম.....

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

শব্দকুট / সুব্রত মাঝি

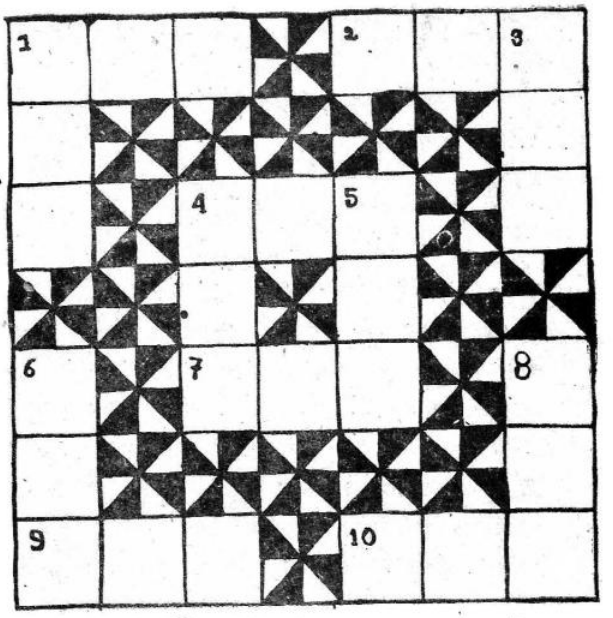

সূত্র ঃ পাশাপাশি ঃ (1) যৌন জনন হয় এমন প্রাণী উত্তরটা আমরা সবাই জানি।

(2) জন্মায় হিমালয়ের কোলে তারে রেণুধর উদ্ভিদ বলে।

(3) বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন বল সে কোন শ্বসন।

(4) বিপাক, মৃত্যু বৈশিষ্ট্য যার নাম বল দেখি তার।

(9) নিকোটিনিক অ্যাসিডের উৎস নাম বল বৎস।

(10) পূর্ণবিস্থায় থাকে না ফুলকা তার দেহ বহিস্ত্বকীয় আঁশে ঢাকা।

উপর-নিচ (1) জোড়া জোড়া চরিত্রবিকাশকারী যুগ্ম জিন হল '—' সঠিক বা নির্ভুল উত্তরটা বল।

(3) সরাসরি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে উদ্ভিদ বলা হয় যাকে।

(4) ভাইটামিনের প্রধান ক্ষেত্র/এরা জন্মায় যকৃতত্র।

(5) ইকোসিস্টেমে শক্তির উৎস কি ? বল, সঠিক উত্তর লিখি।

(6) ভাইটামিন 'ডি' যদি অভাব হয় বল তো, ফলে কি রোগ হয়।

(8) সালোক সংশ্লেষে ইহা অপরিহার্য যার প্রধান উৎস সূর্য।

টিস্যু কোয়াটারস, B-90, ডাক– চন্দ্রহাটি, জেঃ হুগলী।

বিজ্ঞানের টুকরো খবর

উদ্ভিদ জগতের গোপন খবর

বীজ পুঁতলে চারা বেরোয়। তারপর সেই চারা বেড়ে গাছ হয়, তাতে ফুল ও ফল ধরে। এই সব ঘটনা আমরা চোখে দেখতে পাই কারণ এ সবই ঘটে মাটির ওপরে। কিন্তু ঐ একই সময় আমাদের চোখের অগোচরে মাটির নিচে আরও একটা ঘটনা ঘটে। চারার শেকড় পুষ্টির খোঁজে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক কিভাবে সেটা হয়, মাটির নিচে শেকড় কিভাবে জল ও পুষ্টি খুঁজে বের করে বা পুষ্টির অভাবে এ প্রক্রিয়ায় কি পরিবর্তন হয় সে সবের অধ্যয়নের জন্য পুরো গাছ উপড়ে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য কাঁচের বাক্সে চারা পুঁতে গবেষণা চালিয়েছেন কিন্তু তাতে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে এবং তাতে ফল ভাল পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি আমেরিকা সরকারের কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা বাড়ন্ত চারার শেকড়ে বিভিন্ন পরিবর্তন অধ্যয়ন করার এক অভিনব উপায় বের করেছেন যাতে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ঐ নতুন পদ্ধতির নাম "ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং (Magnetic Resonance Imaging)।

এই পদ্ধতিতে শেকড় অধ্যয়নের জন্য পুরো চারা গাছটিকে টব সমেত এক বিশাল যন্ত্রের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার মধ্যে অতি উচ্চশক্তির চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে উদ্ভিদের শেকড়ের জলীয় অংশের হাইড্রোজেন অণুগুলি বিশেষভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যায়। তারপর ঐ চৌম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে নিলে অণুগুলি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে যার ফলে এক ধরনের রেডিও তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ রেডিও তরঙ্গ থেকেই বিশেষ কমপিউটারের সাহায্যে অদৃশ্য শেকড়ের ছবি পাওয়া যায় যা টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের মাটিতে অথবা বাতাসে বিভিন্ন মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রভাবে উদ্ভিদের শেকড়ের বৃদ্ধিতে কি ধরনের পরিবর্তন হয় তা সহজেই পরীক্ষা করা যেতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে কৃষির ক্ষেত্রে যে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

"জিয়োত্তো"র হ্যালি দর্শন

হ্যালির ধূমকেতুর এবারে আবির্ভাবের সময় যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল মহাকাশযান "জিয়োত্তো"র (giotto) খুব কাছ থেকে হ্যালি দর্শন। গত 13 মার্চ হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রের মাত্র 600 কিলোমিটার দূর থেকে "জিয়োত্তো" যে সব ছবি ও তথ্য পাঠিয়েছে তা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলকে অবাক করেছে। আজ পর্যন্ত ধূমকেতুর গঠন সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে ধূমকেতুর কেন্দ্রের কঠিন অংশ প্রধানতঃ ধূলো মেশানো বরফের তৈরি আর সেটাই ধূমকেতুর সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। কিন্তু "জিয়োত্তো" এ ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছে।

"জিয়োত্তো"র পাঠানো ছবিতে দেখা গেছে যে হ্যালির কেন্দ্রের কঠিন অংশের আকার গোল নয়, বরং সেটা অনেকটা লম্বাটে এবড়ো খেবড়ো আকৃতির। লম্বায় প্রায় 15 কিলোমিটার, চওড়ায় 5 থেকে 7 কিলোমিটার। তার রং সাদা নয়, ঘোর কালো। আরও জানতে পারা গেছে যে সৌর উত্তাপের ফলে ধূমকেতুর কেন্দ্রের ঐ অংশ থেকে ক্রমাগত ধূলিকণার ঝড় ছিটকে বেরিয়ে আসছে। ঐ ধূলিকণার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তার শতকরা নব্বুই ভাগই হলো কার্বনজাত পদার্থে তৈরি যাতে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনও পাওয়া গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এ তিনটি পদার্থই হলো পৃথিবীতে জীবকোষের প্রধান উপাদান। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ধূমকেতুর ঐ ধূলিকণায় রয়েছে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস জাতীয় বস্তু যার থেকেই সুদূর অতীতে কোনও এক সময় হয়ত জীবের উৎপত্তি হয়েছিল। অবশ্য এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

জীবের উৎপত্তি হোক বা নাই হোক একটা প্রশ্ন কিন্তু এখানে থেকেই যাচ্ছে। তা হলো, ধূমকেতুর কেন্দ্রের ঐ কালো পদার্থ এলো কোথা থেকে ? এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, শুরুতে হয়ত শুধু শুভ্র বরফের গোলাই ছিল, পরে সৌরমণ্ডলের বাইরের এলাকায় বিচরণের সময় মহাকাশ থেকে ঐ কালো ধূলিকণা বরফের ওপরে এসে জমাট বেঁধেছে।

বিমান বসু

লিখবেন

নাথ রায় ॥ লাল ব্রহ্মচারী ॥ জয় হোম ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিবকালী ভট্টাচার্য ॥ তারকমোহন দাস ॥ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ॥ ক্ষী বিশ্বাস ॥ .পরতন ভট্টাচার্য ॥ জিতকৃষ্ণ বসু ॥ সুধাংশু পাত্রি ॥ অর্ধেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র ॥ রমা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে

•

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার ॥ বিমান বসু ॥ মৃন্ময়ী দাশ ॥ জয়ন্ত বসু ॥ সুবীর দত্ত ॥ প্রসাদকুমার দাস ॥ অশোক বাগচি ॥ সিদ্ধার্থ রায় ॥ দিলীপ সিংহ ॥ অনাদি দাঁ ॥ আবদুল্লাহ আলমুতী ॥ বিমল বসু

•

ছবি আঁকবেন : শৈল চক্রবর্তী ॥ রেবতীভূষণ ॥ সমীর মণ্ডল ॥ মলয় ঘোষাল ॥ মানস বিশ্বাস ॥ গৌতম কর্মকার ॥ দিলীপ দাস ॥ পার্থসারথি মণ্ডল ও আরও অনেকে ।

আন্তর্জাতিক মানের ৩টি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ

কৃতী বিজ্ঞানী ও স্মরণীয় আবিষ্কার নিয়ে ১২টি নির্বাচিত রচনা

মহাকাশে হ্যালির পুনরাবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের সীমা নেই। কিন্তু কি কি জানিয়ে গেল হ্যালির ধূমকেতু ? বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকের ৬টি নির্বাচিত প্রবন্ধ

হ্যালি কি কি জানিয়ে গেল

একগুচ্ছ ছড়া ও কবিতার সঙ্গে থাকবে

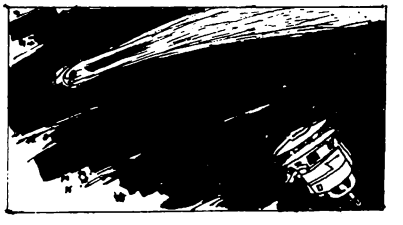

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট

এবং প্রতিবারের মতো এবারেও আশ্চর্য খেলার সরঞ্জাম

অদৃশ্য খেলোয়াড়

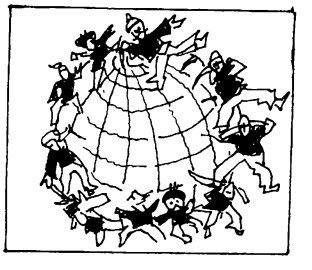

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বি[redacted]

বেরোবে পুজোর অনেক আগেই

R/No 3[illegible]KISHORE JNAN-BIJNAN 6th Yr Vol – 5 SEPT 1986/Regd.No.WBEC/255

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স কুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স কুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স কুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত কুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ কুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী কুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯। প্রতিটি ১০ টাকা

নর পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং
লকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও
দাম ঃ 4·00 টাকা।